উদ্ভিদ্ জগতের বৈচিত্র্য

ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্য

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
এম্-এস্-সি, পি-এইচ্-ডি, এফ্-এল্-এস্।

মূল্য ১·৫০ নয়া পয়সা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—১৩৬৫

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

অর্পিত হইল।

ভূমিকা

এই পৃথিবীতে কোটি কোটি উদ্ভিদ্ আছে। তাদের আকার, তাদের প্রকৃতি, অবস্থান প্রভৃতি বিষয় অনুধাবন করলে কত বৈচিত্র্যই না দেখা যায়। কোনটি সুবিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশাল বিটপী, কোনটি বা এত ছোট যে অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে দেখাই যায় না। কোন কোন উদ্ভিদ্ জন্মে তুষারাচ্ছন্ন মেরু প্রদেশে, আবার কোনটি বা গ্রীষ্মমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করে না। কতকগুলি উদ্ভিদ্ জলে জন্মে, আবার কোনটি মরুভূমির অধিবাসী। এই যে নানা দেশের নানা প্রকার উদ্ভিদের কথা আমরা জানতে পেরেছি, তার মূলে আছে কয়েকজন দুঃসাহসী পর্য্যটকের অভিযান। তাঁরা কখনও একাকী, কখনও দলবদ্ধভাবে নানাদেশ ভ্রমণ করে সেই সব দেশের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই সকল বিবরণ পাঠ করেই পৃথিবীর সকল দেশের সকল প্রকার উদ্ভিদের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, সেগুলি দেখলে বা তাদের কথা মনে হলে মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। এই প্রকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃক্ষলতার কথা ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে লেখা হ'ল। এই বইখানি পাঠ করে যদি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা গাছপালার কথা জানবার জন্য আগ্রহ বোধ করে, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই বইখানির প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি ১৩৬৩ সালের ও একটি ১৩৬৪ সালের বার্ষিক শিশুসাথীতে এবং বাকিগুলি মাসিক শিশুসাথীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এইগুলি এখন একত্রে পুস্তকাকারে গ্রথিত হল।

এই বইএর ছবিগুলি নানা বই থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তিনখানি এঁকে দিয়েছেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস ও আর একখানি এঁকেছেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ সরকার। বাকি সবগুলিই শ্রীসৃষ্টিধর দে এঁকে দিয়ে আমাকে অশেষভাবে ঋণী করেছেন।

শিবপুর
ফাল্গুন, ১৩৬৪

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বড় ফুল	...	...	১
ওয়েলউইটশিয়া	..	...	৭
বড় পাতা	...	...	১১
পাম গাছ	...	...	১৭
লাইকেন্	...	...	২২
সুন্দরবনের গাছ	...	..	২৫
বড় গাছ	...	...	২৮
কৃষ্ণবট বা গোকর্ণবট	...	...	৩৫
ম্যানড্রেক	...	...	৩৮
ফুলের গন্ধ	...	...	৪২
চিরস্থায়ী পুষ্প	...	...	৪৬
পুনর্জীবিত উদ্ভিদ্	...	...	৫০
জ্যোতিষ্মান্ উদ্ভিদ্	...	...	৫৪
স্ফীতোদর বৃক্ষকাণ্ড	...	...	৫৮
বানরের পিস্তল	...	...	৬১
বড় ফল	...	...	৬৬
আমিশাষী উদ্ভিদ্	...	...	৬৯
বহুরূপী বৃক্ষ	...	...	৭৬

উদ্ভিদ্ জগতের বৈচিত্র্য

বড় ফুল

বড়-ফুলের নাম বলতে হলে অনেকেই বলবে ডালিয়া, ক্রাইসানথিমাম্, পদ্ম, ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ইত্যাদি। কিন্তু ডালিয়া বা ক্রাইসানথিমামকে বড় বলা চলে না, কারণ এই ফুলগুলি পৃথক্‌ভাবে এক একটি করে হয় না, অসংখ্য ফুল একত্র ঘেঁষাঘেঁষিভাবে থাকে বলে একটি প্রকাণ্ড বড় ফুলের মত দেখায়। গেঁদা ফুলের সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। ভিক্টোরিয়া রিজিয়াকে (অন্য নাম ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা) সত্যই বড় ফুল বলা চলে। এই ফুল প্রায় একফুট চওড়া হয়। ভিক্টোরিয়া রিজিয়া দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ-প্রধান অঞ্চলে জন্মে। ইহার গোলাকার পাতা অতি প্রকাণ্ড এবং সেই জন্যই ইহার আদর। এ ফুলটি পদ্ম ফুলের চেয়ে বড় হলেও পদ্মফুলের মত শোভা এর নেই।

হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে এক শ্রেণীর ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুল জন্মে, তার নাম ম্যাগ্‌নোলিয়া ক্যাম্পবেলি। এর সাদা ও গোলাপী ফুলের ব্যাস প্রায় আট ইঞ্চি; শীতের পর নিষ্পত্র বৃক্ষগুলির শাখায় ফুটে ওঠে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এই ফুলগুলি। এক একটি গোলাপ ফুলও বেশ বড় হয়। আর বড় ফুলের মধ্যে ধরা যায় শালুক, জবা, স্থলপদ্ম, ইত্যাদি। ধুতুরার ফুলকেও বড় ফুলের দলে রাখতে হবে; আর দার্জ্জিলিং ও আসামের পাহাড়ে যে দোলন ধুতুরা হয়, তার আট ইঞ্চি লম্বা ফুলের ত' বড় ফূলের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

পৃথিবীতে এমন কয়েকটি উদ্ভিদ্ আছে যার ফুলের কাছে পূর্ব্ববর্ণিত ফুলগুলি আকারে নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। র‍্যাফ্‌লেসিয়া জাতীয় উদ্ভিদের যে ফুল হয়, তার বিশাল আকার কল্পনার যোগ্য। এই ফুল পৃথিবীর বৃহত্তম পুষ্প। এর কোন কোনও ফুলের ব্যাস দেড় ফূট এবং কারও প্রায় তিন ফুট। কিন্তু ফুলের অংশ বাদে উদ্ভিদের অন্য অংশ ফুলের শতাংশের এক অংশও হইবে না এবং এই অংশ সাধারণতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকে। র‍্যাফ্‌লেসিয়া আসলে একপ্রকার পরগাছা। এরা বৃক্ষাশ্রয়ী বৃহৎ লতার ভূমির উপরিস্থিত' মূল আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। এর কাণ্ডাংশ সূক্ষ্ম তন্তুর আকারে আশ্রয়দাত্রী বল্লরীর মূলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তা হতে আহার্য্য আহরণ করে প্রাণ ধারণ করে। এই লতার মূলের উপরেই প্রথমে একটি ছোট ফুলের কুঁড়ি দেখা যায়, সেই কুঁড়িটি ক্রমে বড় হতে হতে

একটি প্রকাণ্ড বাঁধাকপির আকার প্রাপ্ত হয়। ফোটা ফুলের মাঝখানের অংশ একটি বড় সরা বা গামলার মত, তার কিনারায় পাঁচটি বড় বড়
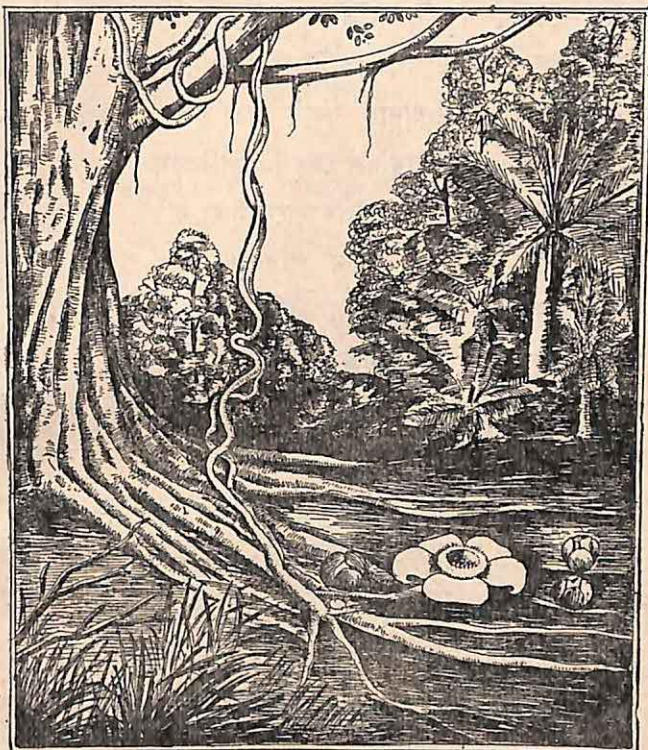
র‍্যাফলেসিয়ার ফুল

পাপড়ির মত অংশ আছে। এই ফুলের বর্ণ হলুদ আর তাতে লালরঙের ছিটা। এর বিশেষ শোভা নেই, আর এতে আছে সুগন্ধের

বদলে একপ্রকার তুর্গন্ধ। সেজন্য আকারে বিশাল হলেও এই ফুলের কোনও আদর নেই।

র‍্যাফ্লেসিয়ার পাঁচটি জাতি আছে। তার মধ্যে সুমাত্রা দ্বীপের র‍্যাফলেসিয়া আর্ণল্ডি ও ফিলিপাইনের অন্তর্গত মিন্ডানাও দ্বীপের র‍্যাফলেসিয়া সাডেন্বার্জিয়ানার ফুলই সর্ব্ব বৃহৎ। এই রকম একটি বড় ফুল বা কুঁড়ির ওজন প্রায় দশ সের। পরিহাসচ্ছলে আমরা বলে থাকি যে, কেউ কেউ নাকি ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়। র‍্যাফ্লেসিয়ার কথা মনে থাকলে আর এ রকম পরিহাস করা চলবে না, কারণ দশসেরি ওজনের একটি ফুল বা কুঁড়ি দিয়ে একটি যুতসই ঘা দিতে পারলে অনেক পালোয়ানেরই মূর্চ্ছা যাওয়ার সম্ভাবনা।

এক জাতীয় অর্কিড্ আছে, তার নাম ফ্র্যাগ্মোপেডিলাম্ কডাটম্। এর নামটি যেমন লম্বা ফুলটিও সেই রকম। অর্কিড্ ফুলের গঠন সাধারণতঃ কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ফ্র্যাগ্মোপেডিলাম্, সাইপ্রিপেডিলাম্, সেলেনিপেডিলাম ও পাফিওপেডিলাম্, এই কয়টি সমগোত্রীয় অর্কিড্। এই সব অর্কিডের ফুলে তুই পাশে তুইটি লম্বা পাপড়ি থাকে ; আর নীচের দিকে একটি পাপড়ি থাকে তার আকার অনেকটা কোশাকুশির মত বা ঠনঠনের চটি জুতার মত। সেজন্য এই গোত্রীয় ফুলের ইংরাজি নাম লেডিস্ স্লিপার্। ফুলের পাশের দিকে যে তুটি পাপড়ি থাকে, সেগুলি সাধারণতঃ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। কিন্তু ফ্র্যাগ্মোপেডিলাম্ কডাটমএর ফুলে এই পাপড়ি তুটি লম্বা হয় ২৪-২৫ কখনও বা ৩০ ইঞ্চি। সুতরাং একটি পাপড়ির প্রান্ত থেকে বিপরীত দিকে পাপড়ির

প্রান্ত পর্য্যন্ত মাপলে এই ফুল ৪ ফুটেরও বেশী চওড়া হয়। এই পাপড়ি দুটি ফিতার মত পাতলা ; ফুলের দুই পাশে দুইটি বেণীর মত ঝুলে থাকে। এক একটি ফুল ১০-১২ দিন পর্য্যন্ত তাজা থাকে। ফুলটি ফোটার সময় এই লম্বা পাপড়ি দুটি ৯-১০ ইঞ্চি লম্বা থাকে, কিন্তু ফুলের অন্যান্য অংশ ফোটার পর সমভাবে থাকলেও এই পাপড়ি দুটি তাদের বাড়ার মাত্রা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন অল্প অল্প করে বাড়তে থাকে। আমেরিকার গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলে অন্য বৃক্ষের উপরে এই অর্কিড্ জন্মে।

হংসলতার ফুল অনেকের বাগানেই দেখতে পাওয়া যায়। হংসলতার বৈজ্ঞানিক নাম এরিষ্টোলোকিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা, কেহ বলেন ইহার নাম এরিষ্টোলোকিয়া জাইগাস্। এরিষ্টোলোকিয়ার অনেক জাতি আছে এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এরিষ্টোলোকিয়া পাওয়া যায়। এইগুলি সবই লতা, কোনটি মাটিতে বা ছোট ছোট ঝোপের উপর লতিয়ে যায়, কোনটি বা বহু দূর বিস্তৃত হয়ে বড় বড় গাছের উপরে উঠে যায়। আমাদের দেশেও কয়েক জাতীয় এরিষ্টোলোকিয়া আছে তার মধ্যে ঈশ্বর মূল বা ঈষের মূল (এরিষ্টোলোকিয়া ইণ্ডিকা) আমাদের পরিচিত। এরিষ্টোলোকিয়ার ফুলের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। এই ফুলের আকার একটি জলের জগ বা কুঁজার মত। নিম্নাংশ চওড়া ও তার উপরের অংশ সরু নলের মত এবং তার পরে ফুলের সামনের দিকে আবার চওড়া হয়ে যায়। এই অংশ সাধারণতঃ অসমান আর জগের কানার মত একদিকে সরু ও লম্বা হয়। এই সকল

ফুলের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এরা পরাগ-নিষেকের জন্য কীট-পতঙ্গকে ফুলের ভিতর একাধিক দিন বন্দী করে রাখে।

হংসলতার ফুল বেশ বড়। এই ফুলের বোঁটার দিক্‌টা হাঁসের পুচ্ছের মত দেখায়। এই অংশ এক পাশে লম্বা ও ক্রমশঃ সরু হয়ে একটি ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা সূতার মত ঝুলতে থাকে। হংসলতার আদি নিবাস গুয়াটেমালা ও তার কাছাকাছি অন্যান্য দেশে। সেখানে তার একটি প্রজাতি আছে, তার নাম ষ্টার্টেভান্টি। এর ফুল ৯ ইঞ্চি চওড়া এবং প্রায় ১ ফুট লম্বা, এবং ফুলের আগায় সূতার মত যে অংশটি ঝুলতে থাকে, তা লম্বায় প্রায় এক গজ হয়ে থাকে। এই ফুলগুলি ঐ সব দেশের ছেলেমেয়েরা টুপির মত মাথায় পরে।

ওয়েলউইটশিয়া

উদ্ভিদ্ জগতের এক আশ্চর্য্য জিনিষ এই ওয়েলউইটশিয়া। এর আকার একটি প্রকাণ্ড শালগমের মত, তবে এর উপরিভাগ চেপ্টা ও মধ্যস্থল নিচু। গাছের উপরদিকে কিনারা থেকে মাত্র দুটি পাতা বার হয়। গাছ যত দিন বাঁচে, এই দুটি পাতাই গাছে থাকে, নূতন পাতা আর হয় না। এই পাতার বৃন্ত থাকে না। এর আকার চামড়ার চওড়া ফিতা বা বেল্টের মত, উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু। গাছের পরিধি যতটা, পাতা তার অর্দ্ধেক চওড়া। পাতাদুটির গোড়া গাছটিকে বেষ্টন করে থাকে।

ওয়েলউইটশিয়া গাছ বাঁচে প্রায় একশ' বছর, আর এই একজোড়া পাতাও বাঁচে ততদিন, আর ততদিনই অল্প অল্প করে বাড়ে। পৃথিবীতে আর এমন কোনও গাছ নেই যার এক একটি পাতা একশ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে, কিম্বা একশ বছর ধরে বাড়ে। যেমন আমাদের আঙ্গুলের নখ প্রতিদিন গোড়া থেকে বৃদ্ধি পায় আর নখটা উপরের দিকে ঠেলে ওঠে, এই পাতাও সেই রকম গোড়া থেকে বৃদ্ধি পায় ও ক্রমশঃ লম্বা হয়ে যায়। পাতার ডগাটি কিন্তু বেশী দিন তাজা থাকে না। পাতা প্রায় এক ফুট লম্বা হওয়ার আগেই পাতার ডগা শুকিয়ে যায়, আর পাতাটি ডগার দিক থেকে ফেটে যায়। এইভাবে পাতা যত বাড়তে থাকে, ডগার দিক থেকে ছিঁড়ে গিয়ে কতকগুলো

ওয়েলউইটশিয়া
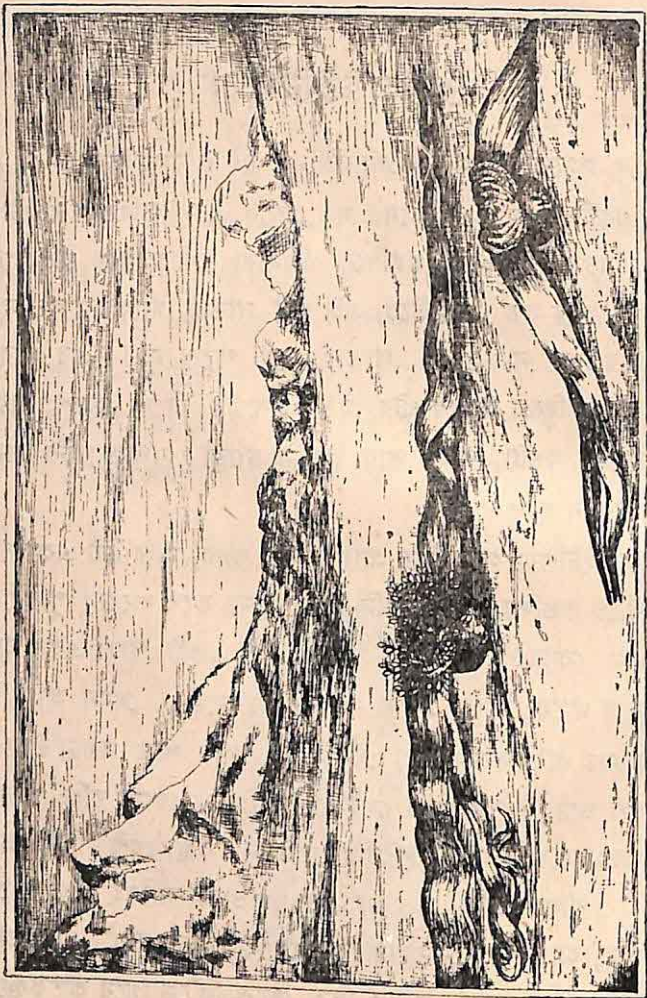
লম্বা ফালি হয়ে যায় আর জমির উপর হাওয়ায় লুটাতে থাকে। পাতা যতই বাড়ে উপরের দিক্ ততই শুকিয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইভাবে পাতার বয়স খুব বেশী হলেও, তা সাত আট ফুটের বেশী লম্বা হয় না। উপরের দিক্ ক্ষয় প্রাপ্ত না হলে, একটি পাতা সম্ভবতঃ একশ বছরে পঁচিশ ফুট লম্বা হতে পারে।

ওয়েলউইটশিয়ার বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর, চারা গাছে দুটি বীজপত্র বার হয়, যেমন আমরা লাউ, কুমড়া, তেঁতুল ইত্যাদিতে দেখি। ওয়েলউইটশিয়ার এই বীজপত্র দুটি দুই বছরেরও বেশী সময় গাছে থাকে, তারপর ঝরে যায়। এই বীজপত্র দুটি বার হবার কিছুকাল পরেই এদের দুই পাশে দুটি পত্র বার হয় এবং এই দুটি পত্রই গাছের শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে।

ওয়েলউইটশিয়ার গাছ উপরিভাগে চারফুট বা তার কিছু বেশী চওড়া হয়, আর উঁচু হয় প্রায় দুই ফুট। গাছের কিনারায় পাতার বেষ্টনীর ভিতর দিকে ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা বার হয়, আর তাইতে ছোট ছোট ফুল হয়। পুং-পুষ্প ও স্ত্রী-পুষ্প পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হয়। ফুলগুলি একক ভাবে হয় না, ছোট ছোট কাঁদিতে হয়, এই কাঁদিকে "কোন" বলে। পাইন-জাতীয় গাছের এই প্রকার বড় বড় "কোন" সকলেরই পরিচিত। ওয়েলউইটশিয়ার প্রধান মূল খুবই লম্বা হয়। অনুমান করা যায় যে, ভিজা মাটির স্তরে না পৌঁছান পর্য্যন্ত প্রধান মূল শেষ হয় না।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী মরু-অঞ্চলে এই গাছ জন্মে।

এক এক জায়গায় তিন চারিটি গাছ ঘেঁষাঘেষি ভাবে হয়। অনেক সময় দেখা যায়—ছুটি গাছ পাশাপাশি অনেক দিন থাকার ফলে কলম বাঁধার মত এক সঙ্গে জুড়ে গেছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ওয়েলউইটস্ এই গাছের নমুনা ও বীজ সংগ্রহ করায় উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীরা এই গাছের সব তথ্য জানতে পারেন। সেই জন্য ডাঃ ওয়েলউইটসের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এই গাছের নাম ওয়েলউটশিয়া রাখা হয়।
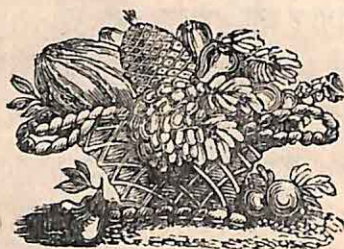
বড় পাতা

তোমরা জান ওয়েলউইটশিয়ার পাতা নিরন্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও অন্যান্য অনেক অনেক গাছের পাতার তুলনায় এই পাতা নিশ্চয়ই বড় হয়। নানাজাতির গাছের মধ্যে পামজাতীয় গাছের পাতাই সাধারণতঃ বড় হয়। তাল, নারিকেল, খেজুর, সুপারী, গোলপাতা, এইগুলি সবই পামজাতীয়। নারিকেল পাতা ও গোলপাতা আমাদের দেশের পামজাতীয় গাছের বা অন্য সব গাছের পাতার মধ্যে বড় বলে ধরা হয়। নারিকেল পাতা সাধারণতঃ ১৫-১৬ ফুট আর গোলপাতা ১৮-২০ ফুট লম্বা হয়, তবে ২১-২২ ফুট লম্বা নারিকেল পাতা ও ২৫ ফুট লম্বা গোলপাতাও দেখা যায়।

তালের পাতা বৃন্ত সমেত ৭-৮ ফুট লম্বা হয়। নারিকেল পাতা অপেক্ষা ছোট হলেও তালপাতা চওড়ায় নারিকেল পাতার সমান। তালের মত আর একটি গাছ আছে তার নাম তালি বা তালিপট। এর ফল ছোট ছোট, বর্তুলাকার। ফলে একটি খুব শক্ত আঁটি আছে, সেজন্য এই ফলের নাম বজ্রবাঁটুল। এই পাতার আকার অবিকল তালপাতার মত, কিন্তু লম্বা ও চওড়া দুই দিকেই তাল-পাতার প্রায় দ্বিগুণ। সাধারণতঃ এই পাতা ১২-১৪ ফুট চওড়া হয়। কিন্তু ১৬ ফুট চওড়া পাতাও দেখা যায়।

সবচেয়ে বড় পাতা হয় ব্রেজিল দেশের এক শ্রেণীর পাম গাছে,

এই গাছের নাম রাফিয়া টেইডিজেরা। এই গাছের পাতা নারিকেল পাতার মত হয়। বৃন্তসমেত এক একটি পাতা ৬০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এবং চওড়া হয় তার অর্দ্ধেক। বিশালতায় এই পাতার আর জুড়ি নেই। এই গাছের পাতা কখনও কখনও ৮০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। রাফিয়া টেইডিজেরা ছাড়া আর কয়েক প্রকার রাফিয়া আছে তাদের পাতাও প্রায় ৫০ ফুট লম্বা হয়। সাবুগাছ এবং আরও অনেক পাম গাছেই এই প্রকার বিশাল পাতা হয়ে থাকে।

বেত হল পাম গাছের সগোত্র এবং বেতের পাতাও বেশ বড় হয়। বেতপাতার নিম্নাংশ বেতের কাণ্ডটিকে নলের আকারে বেষ্টন করে থাকে। এই অংশটিকে বেষ্টনী বলে। কোনও কোনও বেতপাতার ডগাটি লম্বা সূতার মত ঝুলতে থাকে। তাতে সারিবদ্ধ কাঁটা থাকে, আর এইগুলির সাহায্যে বেত গাছ বনের অন্য বড় গাছের উপর উঠে যায়। বেষ্টনী সমেত এই রকম এক একটি পাতা প্রায় ৩০ ফুট লম্বা হতে দেখা গেছে।

পাম জাতীয় গাছের পাতার সঙ্গে দৈর্ঘ্যে তুলনা করা যায় কলা-পাতার। কলাগাছে মাটির নিচে থাকে একটি গোলাকার কন্দ, তার থেকেই পাতাগুলি বের হয়। একটি ফলন্ত কলাগাছ কাটলে তার মধ্যে সাদা রংএর একটি সরল কাণ্ড দেখতে পাওয়া যায়, তাকে আমরা বলি "থোড়"। এই থোড়কে বেষ্টন করে থাকে পাতার বেষ্টনী। মোচা হওয়ার আগে কলা গাছটির মাটির উপরের অংশটা সবই পাতা দিয়ে গড়া ; তখন যে অংশটি কাণ্ডের মত দেখায়, তার

মধ্যে থোড় বা আসল কাণ্ড থাকে না। তাহলে একটি কলাপাতার দৈর্ঘ্য মাপতে হলে মাটির উপর থেকে আরম্ভ করে পাতার ডগাটি পর্য্যন্ত মাপতে হবে। সুতরাং একটি সম্পূর্ণ কলাপাতা ২৫ ফুট বা ততোধিক লম্বা হতে পারে, এবং এর কাছে অনেক পামের পাতাই হার মানে। পান্থপাদপের পাতাও খুব বড় হয় এবং দেখতেও ঠিক কলাপাতার মত, তবে এর কলাপাতার মত লম্বা বেষ্টনী নেই।

কচু জাতীয় গাছের মধ্যেও কতকগুলির পাতা বিশাল আকৃতির হয়ে থাকে। আমাদের দেশে মানকচুর বৃন্ত সমেত এক একটি পাতা প্রায় ৮ ফুট লম্বা হয়। অন্যান্য দেশে এর চেয়েও বড়পাতাওয়ালা কচু গাছ আছে। কচুর স্বগোত্র হ'ল ওল। ওলের পাতার সরল লাঠির মত বৃন্তটি মাটির উপর খাড়াভাবে থাকে, আর উপরে অনেকগুলি পত্রিকায় বিভক্ত শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট একটি বিস্তীর্ণ যৌগ পত্র থাকে। আমাদের দেশে ওল পাতার এই বৃন্তটি সাধারণতঃ ৪ ফুটের কমই হয় আর পাতাটি চওড়া হয় তিন ফুটের মত। সুমাত্রা দ্বীপে একরকম বুনো ওল আছে তার পাতার বৃন্ত ১০ ফুটেরও বেশী, কখনও বা ১৫ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। পাতাটি চওড়া হয় ১৫ ফুট বা তারও বেশী। বৃন্ত ও পত্রফলক নিয়ে পাতাটি লম্বা হয় প্রায় ২০ ফুট।

শিবপুরের বোটানিক গার্ডেন বা কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের পুষ্করিণীতে তোমরা ভিক্টোরিয়া রিজিয়া (অন্য নাম ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা) গাছ দেখে থাকবে। এই জলজ উদ্ভিদের ভাসমান পাতার বিশালতা ও তার সৌন্দর্য্য সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে।

পাতাগুলি গোলাকার, ৪-৬ ফুট চওড়া ; কিনারা উপরের দিকে খাড়া ভাবে ২-৩ ইঞ্চি উঁচু হয়ে থাকে। পাতার উপর দিক উজ্জ্বল সবুজ
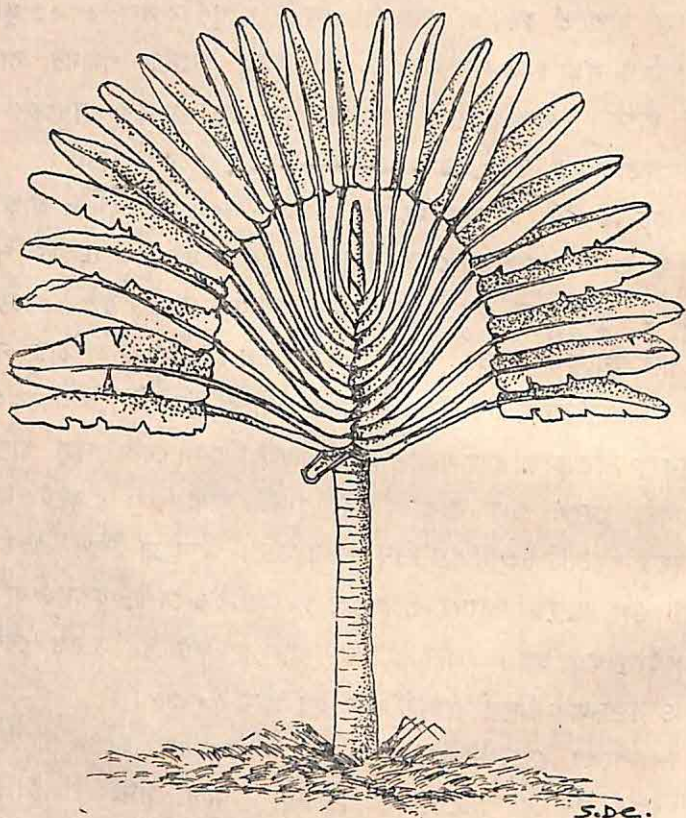
পান্থপাদপ

বর্ণ আর নিচের দিক বেগুনি। পাতার নিচের দিকের শিরাগুলি খুব

উঁচু উঁচু, মনে হয় যেন লম্বা লম্বা দেয়াল গাঁথা রয়েছে। এই পাতার বৃন্ত ৫-৬ ফুট লম্বা। পাতাগুলি যেন এক একটি গোলাকার বজরা, একটি শিশু অনায়াসেই একটি ভাসমান পাতার উপর বসে থাকতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলের জলাশয় ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার আদি নিবাস।

বাংলাদেশের তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি বড় পাতাওয়ালা গাছের পাশে আর একটি গাছ হয়, তার পাতাও নেহাৎ ছোট নয়। এই গাছের নাম সোনাগাছ বা সোনাপাতা গাছ। এই গাছের পাতাগুলি শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট যৌগ পত্র। বৃন্ত সমেত এক একটি পাতা লম্বা হয় ৫-৭ ফুট, আর চওড়া ৪-৫ ফুট। এই গাছগুলি ১৫-২০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এবং এদের শাখা-প্রশাখা বেশী থাকে না। এই গাছের ফল প্রায় ৩ ফুট লম্বা, দেখতে একটি তলোয়ারের মত।

পাম গাছের মত আকৃতির আর এক রকম গাছ অনেকে বাগানে রোপণ করেন, এদের নাম সাইক্যাড বা সাইকাস্। সাইকাসের পাতা ৪-৫ ফুট লম্বা হয়। এই জাতীয় গাছ বহু বৎসর বাঁচে, কিন্তু বেশী বড় হয় না। ফার্ণগাছ তোমরা অনেকেই দেখেছ। এই সব গাছের পাতার গঠন বড় সুন্দর এবং সেজন্য ফার্ণএর খুবই আদর, সাধারণতঃ ফার্ণ গাছের কাণ্ড খুবই ছোট হয়, কোনও কোনও ফার্ণের কাণ্ড থাকেই না। কিন্তু কয়েকটির আবার পাম গাছের মত সরল কাণ্ড থাকে, এইগুলিকে বলা হয় ট্রি ফার্ণ বা ফার্ণ বৃক্ষ। এদের পাতাগুলি বেশ বড় হয় এবং কোন কোনও ট্রি ফার্ণের পাতা একটি বৃক্ষশাখার

মত দেখায়। এই রকম একটি পাতায় অনেকগুলি প্রশাখা থাকে, আর পাতার বিভিন্ন অংশ ক্রমশঃ বিকশিত হতে থাকে।

বাঁশের পাতা তোমরা বোধ হয় অনেকেই দেখেছ। আমাদের দেশে অনেক রকম বাঁশ আছে, তাদের কোনওটিরই পাতা ১০ ইঞ্চির অপেক্ষা বড় হয় না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিস পর্ব্বতে এক রকম বাঁশ হয় তার পাতা ১০ ফুট, কখনও বা ১৫ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়, আর ১ ফুট পর্য্যন্ত চওড়া হয়। এই বাঁশের নাম নিউরোলেপিস নোবিলিস।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গাছের কথা বলব। এর নাম গুয়ারিয়া রোপালোকার্পা ; কালিফোর্ণিয়ার জঙ্গলে এই গাছ জন্মে। এর পাতা ১ ফুট লম্বা, অনেকটা নিম বা মহানিম পাতার মত। আগে যে সব পাতার কথা বলা হয়েছে, সে তুলনায় এই পাতাকে বড় বলা হয় ত চলে না, কিন্তু এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই গাছের এক একটি পাতা ১০-১২ বছর পর্য্যন্ত গাছে থাকে, আর বৃক্ষশাখার মত এই পাতার অগ্রভাগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। পাতার গোড়ার দিকের পত্রিকাগুলি ২-৩ বছর পরে এক একটি করে ঝরে যায়, আর আগার দিকে নূতন পত্রিকা বার হতে থাকে। এই পাতার আয়ুর কথা ভাবলে ওয়েলউইটশিয়ার কথা মনে পড়ে, যদিও সে পাতার পরমায়ু গুয়ারিয়া পাতার প্রায় দশগুণ।

পাম গাছ

উদ্ভিদ্ রাজ্যের এক বৃহৎ গোষ্ঠীর গাছকে পাম গাছ বলা হয়। এই গোষ্ঠীর গাছের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, তন্মধ্যে এদের শাখা-প্রশাখাহীন সরল কাণ্ড আর গাছের আগায় এক গোছা বড় বড় পাতা থাকায় অন্যান্য গাছ থেকে এদের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। পাতার আকৃতি অনুসারে পাম গাছকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন কতকগুলির পাতা গোলাকার এবং কতকগুলির পাতা পাখীর পালকের মত। তাল, তালিপট প্রভৃতি গাছের পাতা গোলাকার এবং নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি গাছের পাতা পাখীর পালকের মত।

পামের মধ্যে এই যে সরল শাখাবিহীন কাণ্ড এরও ব্যতিক্রম আছে। ছয়মাথাওয়ালা খেজুর গাছ বা দুই মাথাওয়ালা নারিকেল গাছ এর কথা শুনা গেলেও খেজুর বা নারিকেলের শাখা থাকা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু একপ্রকার পাম আছে যার স্বাভাবিক ভাবেই শাখা হয়। এই গাছের নাম হাইফীন, চলিত কথায় ইহাকে ডুমপাম বলা হয়। পশ্চিম ভারতের গুজরাট প্রদেশে একপ্রকার ডুমপাম হয়, তার কাণ্ড মাটি থেকে কিছুদূর উঠেই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মিশরদেশে আর একপ্রকার ডুমপাম হয়, তার কাণ্ডটি দুই ভাগে ভাগ হওয়ার পর শাখাগুলিও ঐভাবে ভাগ হয়। সমান ভাগে ভাগ হয় বলে এই গাছের শাখাগুলি সব সমানই হয়, কোনটি ছোট বড় হয় না। ভারতীয় ডুমপামের নাম হাইফীন ইণ্ডিকা আর মিশরের ডুমপামকে বলে হাইফীন থিবেইকা। ডুমপাম ছাড়া আরও কয়েক

জাতের পামের শাখা বের হয়, কিন্তু এ রকম নিয়মিত ভাবে কোনও পামেরই শাখা হয় না। এইখানে যে ডুমপামের ছবি দেওয়া হ'ল সেই পাম গাছটি শিবপুরের বটানিক গার্ডেনে আছে।

মালদ্বীপ এবং ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দিকের কয়েকটি দ্বীপে একপ্রকার পাম গাছ হয়, তার নাম লডয়সিয়া। ইহার চলতি নাম ডবল্ কোকোনাট্ বা যুগ্ম নারিকেল। এই ফলের আকৃতি অতি অদ্ভুত, ঠিক যেন দুইটি বড় নারিকেল পাশাপাশি রেখে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জোড়া কলা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, কলার কাঁদিতে প্রথম অবস্থা থেকে গায়ে লেগে থাকে বলে চাপের জন্য দুটি কলা এই ভাবে জুড়ে যায়। কিন্তু লডয়সিয়ার বেলায় একটি ফলই অসম্পূর্ণ ভাবে বিভক্ত থাকে যে, তাকে ঠিক একজোড়া ফল বলে মনে হয়। নারিকেলের মত এই ফলে ছোবড়া আছে, আর নারিকেল মালার মত দুটি মালা পাশাপাশি জোড়া থাকে। এই ফলের শাঁস খাওয়া যায় না। এই গাছগুলি তালগাছের মত লম্বা হয়, আর এর পাতাও অনেকটা তালপাতার মত। শিবপুরের বটানিক গার্ডেনের পাম হাউসএ একটি লডয়সিয়া গাছ আছে।

তালি বা তালিপট পামের কথা আগে বলেছি। এই গাছের পাতা ঠিক তালপাতার মত, কিন্তু আকারে প্রায় দ্বিগুণ। পাতার বিশালতা ছাড়া এই গাছের আরও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। এই গাছগুলি প্রায় ৩৫ বছর বাঁচে, ৩০-৪০ ফুট পর্য্যন্ত, কোন কোনওটি বা ৭০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়; তারপর আর বাড়ে না। তখন
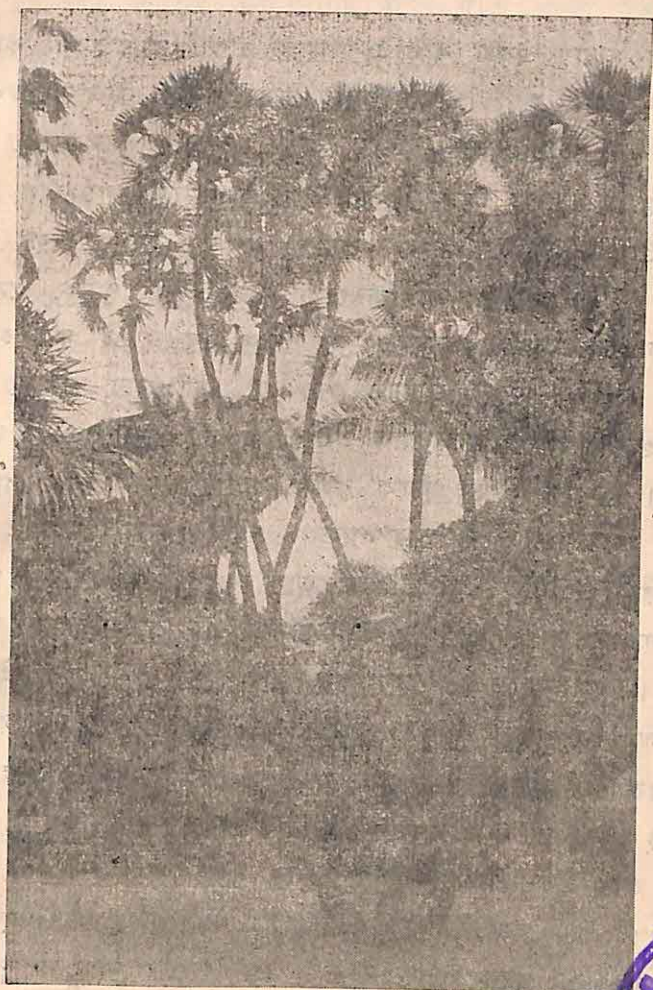
ডুমপাম

গাছের মাথায় একটি শাখা-প্রশাখাযুক্ত প্রকাণ্ড কাঁদি হয়। কাঁদিটি প্রথমে একটি লম্বা খোলার মধ্যে ঢাকা থাকে, কাঁদি বড় হওয়ার সময় তার চাপে হঠাৎ এক সময় বন্দুকের আওয়াজের মত দারুণ জোর শব্দ করে খোলাটি লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়, আর শাখাপ্রশাখা সমেত সমস্ত কাঁদিটি খোলা থেকে বের হয়ে পড়ে। এই কাঁদিতে অসংখ্য ছোট ছোট ফুল থাকে, সেগুলি থেকে অনেকগুলি বর্ত্তুলের মত ফল হয়। এই ফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাছের জীবনও শেষ হয়, দ্বিতীয়বার ফুল হয় না। ফুল হওয়ার আগেই নূতন পাতা হওয়া বন্ধ হয়; যখন ফল হয়, তখনই পাতা শুকিয়ে নীচের দিকে ঝুলতে থাকে, তারপর শুকনা পাতা ও ফল মৃত গাছ থেকে ঝরে পড়ে। এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম "করিফা"। দক্ষিণ ভারত, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল এবং ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের দ্বীপগুলিতে এই জাতীয় পাম পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও করিফা পাম যথেষ্ট পাওয়া যেত, কিন্তু এই দেশ থেকে এখন করিফা লোপ পেয়ে গেছে। শিবপুরের বটানিক গার্ডেনে অনেকগুলি করিফা পাম আছে। এই গাছের বর্ত্তুলাকার ফলগুলি খুবই কঠিন, এজন্য এই ফলকে বজ্রবাঁটুল বলা হয়।

আর একরকম পাম আছে, তার নাম গোমুটি পাম বা এরেং পাম। এর বৈজ্ঞানিক নাম এরেংগা। এইগুলি ২০-৪০ ফুট লম্বা হয় ও ১০-১২ বছর পর্য্যন্ত বাঁচে। এই গাছের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হলে কাণ্ডের উপরের দিকে এক পাশে একটি কাঁদি বের হয়। তার

কিছুদিন পরে কাণ্ডের অন্য পাশে প্রথম কাঁদি থেকে কিছু নিচে আর একটি কাঁদি হয়। এইভাবে উপর থেকে নিচে বিপরীত দিকে এক একটি করে কাঁদি হয় প্রায় মাটির কাছ পর্য্যন্ত। শেষ কাঁদিটির ফুল হওয়ার পর গাছ মরে যায়। তখন কাণ্ডটি ফাঁপা হয়ে যায়, এবং একটি বিরাট নলের মত দাঁড়িয়ে থাকে। এরেংগার কাঁদি কেটে দিলে বোঁটা থেকে এক রকম মিষ্ট রস বের হতে থাকে। এরেংগার প্রায় ১৫টি জাতি আছে, তার মধ্যে দক্ষিণ ভারতে একটি এবং আসাম ও ব্রহ্মদেশে একটি পাওয়া যায়। শেষোক্ত গাছটি মালয়ে ও জাভাতেও জন্মে। আর এই গাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্ট রস পাওয়া যায়। জাভায় এই গাছের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এক রাজকন্যার সহিত তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক রাজার বিবাহ স্থির হয়। এই বিবাহ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাজকন্যা তাঁর প্রাসাদের উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েন। সেই জায়গায় একটা গর্ত্ত হয় এবং সেই গর্ত্তে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। পরে, সেখানে এই পামগাছ হয়। এই পামগাছের কাঁদি কাটলে যে রস বের হয়, তা নাকি সেই রাজকন্যার চোখের জল। সেইজন্য মিষ্ট রস সংগ্রহ করার জন্য যখন তারা গাছের কাঁদি কাটে, তখন তারা রাজকন্যার উদ্দেশ্যে একটি ছড়া বলে :—

কাঁদ তুমি দয়া করি কাঁদ একবার
কাঁদিয়া বহাও তব অশ্রু পারাবার।

লাইকেন্

একটি গল্প শুনেছিলাম, এক সময়ে এক অন্ধ ও এক খঞ্জ লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাদের দু'জনেরই ইচ্ছামত চলাফেরা করার অসুবিধা ছিল বলে তারা একটি ফন্দি বার করল। তারা যখন যেখানে যেত, অন্ধ লোকটি তার খঞ্জ বন্ধুকে কাঁধে নিয়ে যেত, আর খঞ্জ লোকটি তার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে অন্ধকে চলাফেরার নির্দ্দেশ দিত। এইভাবে তারা তাদের পথ হাঁটার অসুবিধা দূর করেছিল।

উদ্ভিদ্ জগতেও এরকম বন্ধুত্বের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শৈবাল ও ছত্রাক এই দুই শ্রেণীর উদ্ভিদ্ হ'ল অতি নিম্ন স্তরের উদ্ভিদ্, এদের না আছে পাতা, না হয় ফুল বা ফল। শৈবাল সূর্য্যকিরণের সাহায্যে নিজের খাদ্য তৈরী করতে পারে, আর ছত্রাক তা পারে না বলে পচা খড়কুটা, ভিজা কাঠ ইত্যাদির উপর জন্মায়। এদের মধ্যে কয়েক জাতীয় শৈবাল আর কতকগুলি ছত্রাক নিজেদের মধ্যে মিতালি করে এক নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় লাইকেন্। ছত্রাক ও শৈবালের শৈশব অবস্থায় দুটির মিলন হলে দুইএর কোষগুলি এক সঙ্গে মিশে একটি লাইকেনের দেহ গড়ে তোলে। লাইকেনের দেহে শৈবাল ও ছত্রাকের অংশ পৃথক পৃথক থাকে না, তবে ছত্রাকেরই প্রাধান্য থাকে। এই জাতীয় ছত্রাকে যদি সময়মত শৈবালের সংযোগ না হয়, তাহলে সেগুলি তাড়াতাড়ি মরে যায়। লাইকেনের দেহে

শৈবালের কোষগুলি সূর্য্যকিরণের সাহায্যে বাতাস হ'তে যে খাদ্য তৈরী করে, তা ছত্রাকের কোষগুলিরও কাজে লাগে। আবার ছত্রাকের কোষগুলি জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে, আর এক প্রকার অম্লরস তৈরী করে যার দ্বারা পাথরকেও ক্ষয় করে দিয়ে সেখানে লাইকেনের
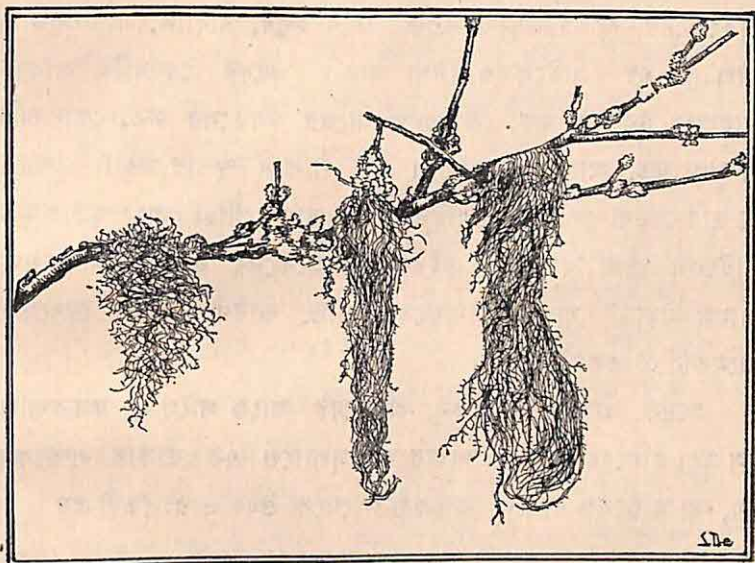
লাইকেন্

দেহটাকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করে। কবি সুকুমার রায়-এর কাছে আমরা হাঁসজারু আর টিয়ামুখো গিরগিটির কথা জেনেছি ; লাইকেন্ যেন সেই রকম একটি স্বাভাবিক উদাহরণ।

লাইকেন্ প্রায় পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া যায়, তবে শীতের

দেশেই বেশী লাইকেন্ দেখা যায়। হিমালয় পাহাড়ে অনেক উঁচুতে যে সব গভীর অরণ্য আছে, যে সব জায়গা বেশীর ভাগ সময়ই কুয়াশায় ঢাকা থাকে, সেখানে অনেক রকমের লাইকেন্ দেখা যায়। কোনগুলি পাথরের উপর, কোনগুলি অন্য গাছের উপর হয়ে থাকে। সাধারণতঃ লাইকেনের রং হয় ধূসর সবুজ ; তবে হলুদ, বাদামি, গাঢ় সবুজ ও কাল রং-এর লাইকেন্ও দেখা যায়। এদের কোনটির আকার কাগজের টুকরার মত, কোনগুলি মাছের আঁইসের মত, কোনগুলি ফিতার মত, আবার কোনগুলি জট পাকান স্থতার মত। এখানে যে ছবি দেওয়া হল, তাতে পাইন গাছের ডালে গোছা গোছা স্থতার মত লাইকেন্ দেখা যাচ্ছে। এইরকম লাইকেনের ইংরাজি নাম "ওল্ড ম্যান্স্ বিয়ার্ড" বা বুড়ো মানুষের দাড়ি, কারণ এগুলো দেখতেও অনেকটা ঐ রকমই কিনা !

কয়েক প্রকার লাইকেন্ আমাদের কাজে লাগে। কতকগুলি হল বন্য হরিণের খাদ্য। আবার আইসল্যাণ্ডে এক প্রকার লাইকেন্ হয়, তা মানুষেও খায়। কতকগুলি থেকে ঔষধ ও রং তৈরী হয়।

সুন্দরবনের গাছ

তোমরা জান যে, গাছের শিকড় গাছকে মাটিতে ধরে রাখে, আর মাটির রস শোষণ করে গাছের পুষ্টিসাধন করে। এই শিকড় মাটির নিচে থাকলেও তার বাতাসের দরকার হয় এবং মাটিতে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণার মধ্যে যে সামান্য বাতাস থাকে, তাতেই তার প্রয়োজন মিটে যায়। জলজ উদ্ভিদেরা সাধারণতঃ জলে মিশে থাকা বাতাসেই কাজ চালিয়ে নেয়। দূষিত জলা যায়গায় এমন কতকগুলি গাছ আছে যাদের শিকড়ের বাতাস পাওয়ার জন্য এক আশ্চর্য্য ব্যবস্থা আছে। এই সকল গাছের শিকড় যেমন মাটির ভিতর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে, তেমনি উপরের দিকেও এক একটি শাখা মাটি ভেদ করে বের করে দেয়। এই শাখাগুলি মাটির উপর ৭-৮ ইঞ্চি অথবা আরও অধিক উঁচু হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সুন্দরবনে যে সুন্দরী বা সুঁদরী গাছ আছে, তার এই রকম উর্দ্ধগামী শিকড় আছে। সুন্দরী গাছ যে জায়গায় জন্মায়, সে সব জায়গা অধিকাংশ সময় সমুদ্রের লোনা জলে ডুবে থাকে, সেজন্য তার শিকড় বাতাস পায় না। তাই এই গাছের শিকড়ের ঐ রকম উর্দ্ধগামী শাখা হয়। কোনও সুন্দরী গাছের কাছে গেলে দেখা যাবে গাছের চতুর্দ্দিকে মাটির উপর অনেকগুলি এই রকম শিকড় খোঁটার মত উঁচু হয়ে আছে। সুন্দরী গাছ ছাড়া সুন্দরবনে এবং ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর

অন্য স্থানে আরও অনেক গাছ আছে যাদের উর্দ্ধগামী শিকড় হয়। এখানে যে ছবি দেওয়া হল, তাতে দেখা যাচ্ছে, একটি বড় গাছের

গোড়ায় উই ঢিবির মত কতকগুলি জিনিষ রয়েছে, আসলে ঐগুলি হ'ল ঐ গাছটির উর্দ্ধগামী শিকড়। ঐ গাছের নাম ট্যাক্সোডিয়াম্—এ গাছ

হয় আমেরিকায়। এই শিকড়গুলি দুই ফুট বা তারও বেশী উঁচু হয়। শিবপুর বটানিক গার্ডেনে এই গাছ আছে।

সুন্দরবনের নিচু যায়গায় যে সমস্ত গাছ আছে, তাদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, মাটির উপরে গাছের গোড়া থেকে অনেক শিকড় বের হয়ে গাছটিকে চারদিক থেকে নরম মাটির সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকে, এবং গাছটিকে জলের ধাক্কায় ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। এই রকম জায়গায় গাছের বীজ মাটিতে পড়ার পর অঙ্কুরিত হওয়ার বড়ই অসুবিধা। সেজন্য এই সব জায়গায় গাছের বীজ জলে ভেসে থাকে, আর ভিজা থাকলেও পচে যায় না। কতকগুলি গাছ বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার এই অসুবিধা এক অভিনব উপায়ে দূর করেছে। এই সব গাছের ফল পাকার পর—ফল কিংবা তার বীজ অন্য গাছের মত মাটিতে ঝরে পড়ে না। ফল গাছে লেগে থাকা অবস্থাতেই তার বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর ফলের ভিতর দিয়ে প্রধান শিকড় বের হয়ে আসে, আর বড় হ'তে থাকে। এইভাবে বাড়তে থাকার সময় এই শিকড়ের ভারেই অঙ্কুর সমেত ফলটি বোঁটা থেকে খসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে নিচের নরম মাটিতে সেই শিকড় বিঁধে যায়। মাটিতে পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রধান শিকড় হতে অনেকগুলি ছোট ছোট শাখা বের হয়ে আসে এবং তার ফলে জোয়ারের জলে সেই চারাটির আর স্থানচ্যুতির ভয় থাকে না।

বড় গাছ

তোমাদের মধ্যে যারা সংস্কৃত পড়েছ, তারা সকলেই জান যে, "অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালশাল্মলিতরুঃ।" শাল্মলিতরু বা শিমুলগাছ গোদাবরীর তীর ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও হয়, আর সেগুলি যে বিশাল তরু হয়ে থাকে, সে বিষয়ে মতভেদ নেই। সমগোত্র হল শ্বেত শিমুল, এর ফুল শাদা আর শিমুলের ফুলের চেয়ে অনেক ছোট। শ্বেত শিমুলের গাছ আসল শিমুলের মতই বড় হয়। এই গাছ দক্ষিণ ভারতে জন্মে। অশ্বত্থ ও বট, এগুলিও যে বিশাল আকারের হয়, তা সকলেই জান। এইসব গাছের উচ্চতা এক শ' ফুট পর্য্যন্ত হতে পারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় আমরা এক রসাল বা আম গাছের কথা জেনেছি। সেই গাছটি উচ্চস্বরে আপন মহিমা কীর্ত্তন করছিল এবং তার অতি বৃহৎ আকার সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করছিল। তার এই কাজের পরিণাম ভাল ত হ'লই না, এমন কি গাছটি যে খুব বড় ছিল, সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ থেকে গেল; কারণ আমরা জানি—"আপনারে বড় বলে, বড় সেই নয়।" তবে কিছুদিন আগে পঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে একটি আমগাছ কেটে ফেলা হয়। তার সম্বন্ধে খবরের কাগজে যা লেখা হয়েছিল, তাতে জানা গেল যে, ঐ গাছটি উচ্চতায় প্রায় ৮০ ফুট ছিল, আর তার ডালপালাগুলি বহুদূর

বিস্তৃত ছিল। সুতরাং আমগাছও যে প্রকাণ্ড হতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে মাথা তোলে আকাশে।" এই তালগাছও মাঝে মাঝে এক শ' ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে।

আর একটি গাছ পশ্চিম ভারতে পাওয়া যায়, তার নাম বাওবাব। হিন্দিতে একে বলে গোরখ আম্‌লি। এই গাছের আদি নিবাস আফ্রিকায়। বাওবাব গাছ খুব উঁচু হয় না বটে, কিন্তু এর একটি পুরাতন গাছের গুঁড়ি এত মোটা হয় যে, তার ব্যাস প্রায় চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত হতে পারে।

সেগুন গাছ ভারতবর্ষে আর ব্রহ্মদেশে হয়। ভারতে সেগুনের উচ্চতা এক শ' ফুটএর বেশী হয় না, কিন্তু ব্রহ্মদেশে এই গাছ এক শ' কুড়ি ফুট উঁচু হয় ব'লে জানা যায়। ব্রহ্মদেশে আর একটি গাছ হয়, তার নাম গর্জন। এই গাছ দুশ' ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়।

বাঁশ গাছের উচ্চতাও কম নয়। আমাদের দেশে এক রকম বাঁশ আছে, তা এক শ'—এক শ' কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়, আর গোড়ার দিকে সেই বাঁশ চওড়া হয় প্রায় এক ফুট। আর এক রকম লতা বাঁশ আছে, তাও ঐ রকমই লম্বা হয়ে থাকে।

দক্ষিণ ভারতের বল্কল বৃক্ষের নাম বোধ হয় তোমরা শুনেছ। এই গাছের ছাল থেকে কম্বলের মত একটা জিনিষ পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় বল্কল। পুরাকালে বনবাসী লোকেরা এই বল্কলে তাদের দেহ

আচ্ছাদন করত। মালাবার অঞ্চলে এই গাছ কখনও কখনও ২৫০ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়। আমাদের দেশে এই গাছের উচ্চতাই সবচেয়ে বেশী।

এইবার বিদেশের বড় গাছের কথা একটু আলোচনা করা যাক। মেক্সিকো দেশে টিউল সহরে একটি বিরাট বৃক্ষ আছে। এর নাম ট্যাক্‌সোডিয়াম মেক্‌সিকানম। এর বয়স নাকি তুই হাজার বছরেরও বেশী। এই গাছটির উচ্চতা প্রায় এক শ' ত্রিশ ফুট, আর কাণ্ডটির পরিধি এক শ' পনেরো ফুট।

এর চেয়েও অনেক বড় আর প্রাচীন গাছ আছে, তার নাম সিকোইয়া। এই গাছ জন্মায় কালিফোর্ণিয়ার অরণ্যে। সেখানে মারিপোসা নামে এক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি সিকোইয়া গাছ আছে। তার প্রত্যেকটা তিন শ' পঞ্চাশ ফুটএর বেশি উঁচু। একটি গাছ আছে, তার উচ্চতা তিন শ' তেষট্টি ফুট এবং এর কাণ্ডের নিম্ন ভাগের পরিধি এক শ' সতেরো ফুট। পণ্ডিতেরা হিসাব করে বলেন যে, এই গাছটির বয়স চার হাজার বছরেরও বেশী। এই রকম বড় প্রাচীন বৃক্ষ কালিফোর্ণিয়ায় নিশ্চয়ই আরও অনেক ছিল, কিন্তু মানুষের প্রয়োজন আর প্রাকৃতিক তুর্যোগ তাদের নিশ্চিহ্ন করেছে। এখন ঐখানকার সরকার দর্শনীয় বস্তু হিসাবে ঐ সব প্রাচীন বৃক্ষ সংরক্ষিত করে রেখেছেন। এই রকম পুরাণ গাছের গুঁড়িতে অনেক সময় বড় বড় গর্ত্ত হয়ে যায়। একটি সিকোইয়া গাছের গুঁড়ির গোড়ায়—গাছের এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্য্যন্ত একটি প্রকাণ্ড সুড়ংগ হয়ে গেছে, তার মধ্য দিয়ে একটি গাড়ী অনায়াসে

চলে যেতে পারে। একটি গাছ চার হাজার বছরের ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রাঘাত উপেক্ষা করে গর্ব্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

এই রকম বড় গাছ ঝড়ে পড়ে গেলে, কিংবা কেটে ফেলা হ'লে,
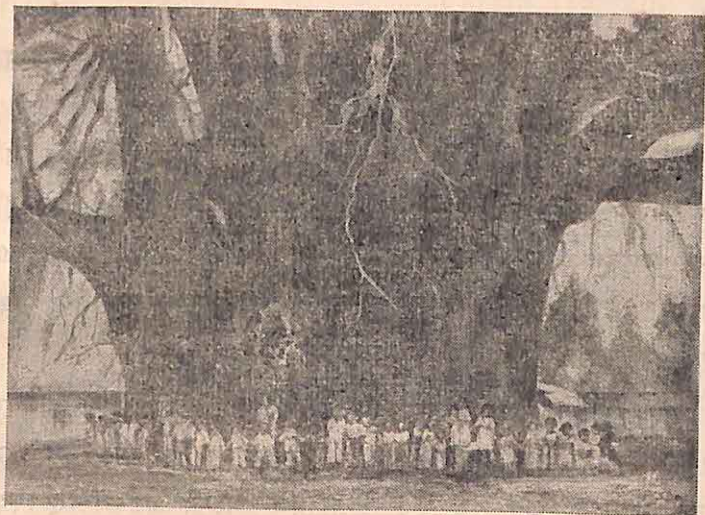
টিউল সহরের বিশাল বিটপী

তার কিছু অংশ নমুনা হিসাবে বিভিন্ন যাত্নঘরে সংগ্রহ করে রাখা হয়। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সিকোইয়া গাছের কাণ্ডের একটি চক্রাকার অংশ আছে। তা থেকে জানা যায় যে, ঐ গাছটি তেরশো পঁয়ত্রিশ বছর বেঁচে ছিল। ব্রাসেল্‌স্‌এর যাত্নঘরে একটি কর্ত্তিত অংশ আছে, তা তেরশো পঞ্চাশ বছর বয়সের পুরাণ একটি গাছ

থেকে পাওয়া গিয়েছে। বার্লিনের যাতুঘরেও একটি চক্রাকার অংশ ছিল, তার ব্যাস ছিল চৌদ্দ ফুট। জানা যায়, ঐটি যে গাছের অংশ, সেই গাছটি চার শ' কুড়ি ফুট উঁচু ছিল, আর কাণ্ডের নিম্নভাগের পরিধি ছিল নব্বই ফুট। এই গাছটির বয়স হয়েছিল তেরশো ষোল বছর।

এই সমস্ত খণ্ডিত অংশ থেকে গাছের বয়স জানা যায়, আর বোঝা যায় যে, এই গাছগুলি প্রথম দশ বছরে খুব দ্রুত বাড়তে থাকে, তারপর প্রায় এক শ' বছর পর্য্যন্ত তার বাৎসরিক বৃদ্ধি অর্দ্ধেক কম হয়ে যায়, তারপর আরও পাঁচ শ' বছরে বাৎসরিক বৃদ্ধি আরও অর্দ্ধেক কম হয়ে পড়ে, এইভাবে গাছের বয়স যখন এক হাজারের উপর হয়ে যায়, তখন তার বৃদ্ধি খুবই কম হয় এবং গাছটি প্রায় এক ভাবেই থেকে যায়।

এই যে বিশাল সিকোইয়া গাছ, এও কিন্তু এক বিষয়ে আমাদের দেশের বট গাছের কাছে হার মানে। বট গাছের যে ঝুরি হয়, সেই ঝুরির সাহায্যে এর বড় বড় শাখাগুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। শিবপুর বটানিক গার্ডেনে যে বট গাছটি আছে, তার বয়স প্রায় দুশ' বছর এবং এর উচ্চতা প্রায় আটানব্বই ফুট। কিন্তু এই গাছটি শাখা প্রশাখা বিস্তার করে যে জায়গাটি জুড়ে আছে, তার পরিধি হল তেরো শ' ফুটেরও বেশী। অন্য কোনও গাছ এতটা জায়গা ঢেকে ফেলতে পারে না। এই বট গাছটির চেয়ে আরও অনেক বড় বট গাছের কথা বই-এ পড়া যায়। মহারাষ্ট্র

দেশে সাতারা জিলায় একটি বহু প্রাচীন গাছ আছে, তার বয়স বোধ হয় চার শ' বছর। এই গাছটি যতখানি জায়গা জুড়ে আছে, তার পরিধি হ'ল প্রায় ষোল শ' ফুট। অন্ধ্র উপত্যকায় এর চেয়েও বড় একটি বট গাছ ছিল বলে জানা যায়। এই গাছটির তিন হাজার ঝুরি ছিল। যে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এই গাছটি বিরাজমান ছিল,
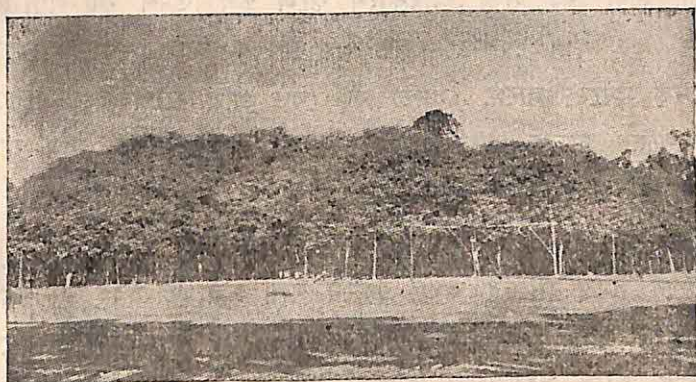
শিবপুর বটানিক গার্ডেনের বিশাল বটবৃক্ষ

তার পরিধি ছিল তুই হাজার ফুট। সেই গাছের ছায়ায় বিশ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করতে পারত।

আর এক রকম গাছের কথা বলা দরকার, তা হ'ল ইউকালিপটস্। ইউকালিপটস্ অনেক প্রকার আছে, সবগুলিরই আদি নিবাস অষ্ট্রেলিয়া। এদের সবগুলিই খুব উঁচু হয়। এর মধ্যে কতকগুলি উচ্চতায় তিন শ' ফুট পর্য্যন্ত হয়। শুনা যায় যে, অষ্ট্রেলিয়ার অরণ্যে তিন শ' ফুটেরও

বেশী উঁচু গাছ ছিল; কিন্তু ঐ দেশের শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা বসতি স্থাপন করার জন্য অরণ্যাঞ্চল পরিষ্কার করার সময় সেই সব পুরাণ গাছ ধ্বংস করে ফেলেছে।

এই সমস্ত বিশাল বিটপীর সঙ্গে আর একটি গাছের কথাও বলা উচিত। তা হল বেত। বেত নানা রকমের আছে, তার প্রায় সবগুলিই লতা, এবং এই লতা অধিকাংশ স্থলে দুশ'-তিনশ' ফুট লম্বা হয়। ছয়শ' ফুট লম্বা বেতস লতাও অস্বাভাবিক নয়। বেত আমাদের অনেক কাজে লাগে, সেজন্য বড় বেত প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। হিমালয়ের অনেক পার্ব্বত্য নদীর উপর বেতের পুল দেখা যায়। কয়েকটি বেত নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে টাঙ্গান হয় এবং তাতেই এই ঝুলান পুল তৈরী করা হয়।

যে সমস্ত গাছের কথা এখানে বলা হ'ল, তা সবই উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ্। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ্ হ'ল শৈবাল। শৈবালের মধ্যেই আছে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ্, তাদের শরীর একটি মাত্র কোষ দিয়ে তৈরী এবং তাদের দেখতে হলে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে, শুধু চোখে আমরা তাদের দেখতে পাই না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই শৈবালের মধ্যেও এমন উদ্ভিদ্ আছে যা লম্বায় দুশ' ফুট বা তারও বেশী হতে পারে। এর আকৃতি ফিতা বা দড়ির মত। ঐ শৈবাল সমুদ্রের তলদেশে জন্মায়।

কৃষ্ণবট বা গোকর্ণবট

আমাদের দেশের বটগাছ তার বিশাল আকৃতি এবং তার শাখা থেকে যে অসংখ্য ঝুরি নামে, তার জন্য জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। বটেরই মত আরও একটি গাছ তার পাতার বিশেষত্বের জন্য লোকের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এই গাছের নাম "কৃষ্ণবট" বা "গোকর্ণবট"। এই গাছের প্রত্যেকটি পাতা এক একটি ঠোঙ্গার মত। দেখলে মনে হয়, একটি সাধারণ বটপাতার নিম্নাংশ ছুই পাশ থেকে মুড়ে নিয়ে পানের খিলির মত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা অনেক সময় দেখি, নানা রকম কীট গাছের পাতাকে বাঁকিয়ে পাতার ছুই পাশ জুড়ে তার মধ্যে বাসা তৈরী করে কৃষ্ণবটের পাতা দেখলে মনে হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিন্তু এই গাছের প্রত্যেকটি পাতা স্বাভাবিক ভাবে কচি অবস্থা থেকেই এইরকম ঠোঙ্গার মত হয়ে থাকে।

কথিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের একটি সাধারণ বটগাছের পাতাকে ঐ ভাবে মুড়ে নিয়ে তাতে ননী রেখে খেয়েছিলেন। তাঁরই ইচ্ছায় ঐ গাছের সব পাতা আপনা থেকেই ঐ রকম ঠোঙ্গার মত হয়ে যায়। এখন যতগুলি কৃষ্ণবটের গাছ আছে, সবগুলিকেই ঐ একটি গাছেরই বংশধর বলে মনে করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে এই যে নূতন রকম গাছের সৃষ্টি হল, তার নাম হল কৃষ্ণবট। এই গাছের পাতার আকৃতির সঙ্গে গরুর কানের সাদৃশ্য আছে বলে এই গাছের আর একটি নাম হ'ল গোকর্ণবট।

এই গাছ সাধারণ বটগাছের মত যেখানে-সেখানে দেখা যায় না। যেখানেই এই গাছ আছে, সেখানেই সেটি মানুষের দ্বারা রোপিত হয়েছে। বট অশ্বত্থের মত আপনা হতে কোথাও জন্মায় না। শিবপুর বটানিক গার্ডেনে প্রায় ৬০ বছর আগে দুইটি কৃষ্ণবটের ডাল রোপণ করে দুইটি গাছ করা হয়; তারপর সেই গাছ থেকে ডাল কেটে আরও অনেকগুলি গাছ করা হয়েছে। বটানিক গার্ডেনে আনার পর উদ্ভিদ্‌বেত্তাদের নজর এর উপর পড়ে এবং গাছটিকে পর্য্যবেক্ষণ করে তাঁরা এর নাম দেন ফাইকাস্ কৃষ্ণি। যে কিংবদন্তী অনুসারে এর নাম কৃষ্ণবট হয়েছে, তা ছাড়া এই গাছের সম্বন্ধে আরও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রাম যখন বনবাসে ছিলেন,
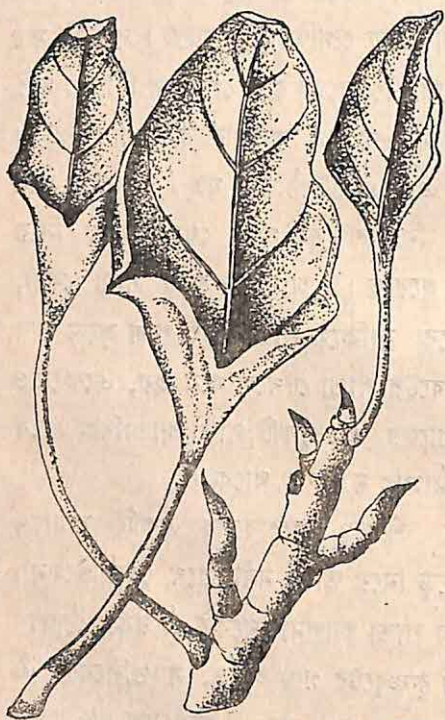
তখন তিনিই কোনও এক সময়ে এই গাছের পাতাকে ঐ ভাবে মুড়ে দিয়েছিলেন।

শিবপুর বটানিক গার্ডেনে যে কৃষ্ণবট আছে, প্রায় ১০ বছর আগে একবার দেখা গেল যে, একটি গাছের একটি ডালে কতকগুলি পাতা ঠোঙ্গার মত না হয়ে সাধারণ বট গাছের পাতার মত হয়েছে! এই ব্যাপারে এই গাছটির প্রতি আবার সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। পরে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, কৃষ্ণবটের বীজ থেকে যে চারা হয়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ বটের মত হয়; সেগুলি বড় হলে তাতে ঠোঙ্গার মত পাতা হয় না। যদি একশতটি কৃষ্ণবটের বীজ থেকে চারা করা যায়, তা হলে অন্ততঃ ৯০টি হবে সাধারণ বটগাছের চারার মত, যেগুলি বড় হ'লে সাধারণ বটগাছ হবে; আর দশটি চারা হবে কৃষ্ণবটের মত, যা বড় হয়ে কৃষ্ণবট হয়ে উঠবে। যদি ডাল কেটে বা গুটি কলম করে কৃষ্ণবটের চারা করা হয়, তা হলে সেই চারাগুলি সবই কৃষ্ণবট হয়ে ওঠে, সাধারণ বট হয় না। এই সব ব্যাপার লক্ষ্য করে উদ্ভিদ্‌বেত্তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কৃষ্ণবট আসলে সাধারণ বটেরই একটি রূপান্তর মাত্র। সাধারণ বটের মতই কৃষ্ণবটেরও শাখামূল বা ঝুরি হয়, তবে কৃষ্ণবট সাধারণ বটের মত বিশালাকার হয় না।

ম্যানড্রেক

নুরেমবুর্গ সহরের মিউজিয়ামে একটি ছবি আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি লোক শিঙা বাজাচ্ছে, তার পায়ের কাছে আছে একটি কুকুর, আর মাটি ভেদ করে উঠছেন জটাজুটধারী মুনিঋষির মত একটি লোক, তার মাথার উপর ফুলপাতাসমেত একটি গাছ। আসলে জটাধারী মানুষের মত যে জিনিষটি দেখছ, তা একটি গাছের শিকড়। এই গাছের নাম ম্যান্‌ড্রেক, বৈজ্ঞানিক নাম ম্যান্‌ড্রাগোরা। এই উদ্ভিদ্‌টিকে প্রাচীনকালের লোকেরা রক্তমাংসের তৈরী মানুষ বলে মনে করত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এর অনেক উল্লেখ আছে।

এই উদ্ভিদ্‌টি একটি ছোট ওষধি বিশেষ। এর আকার অনেকটা মূলার মত। এর মোটা শিকড় মাটির ভিতর থাকে, আর মাটির উপর কতকগুলি পাতা ছত্রাকারে থাকে। এই যে মূলার মত শিকড়, তা নীচের দিকে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং মনে হয় যেন একটি মানুষের শরীর থেকে দুটি পা বেরিয়েছে। কখনও শিকড়ের উপর দিকে দুই পাশে দুইটি শাখা বের হয়; সে দুটিকে মানুষের হাতের মত দেখায়। ঐ যে মানুষের আকৃতির সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য, এ হতেই সে যুগের লোকের ধারণা হয়েছিল যে, এটা সাধারণ গাছ নয়, কোনও নৈসর্গিক প্রাণী, এবং এই গাছ বা গাছের রূপধারী প্রাণী বিশেষ যাদুশক্তি সম্পন্ন। বশীকরণের উদ্দেশ্যে লোকে এই

গাছ তাদের কাছে রাখত। ইহা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য বা কাছে রাখার জন্য অনেক লোকের শাস্তি হওয়ার কথাও শুনা যায়।

এই রকম রক্তে মাংসে গড়া মানুষের মত যে গাছ, তাকে মাটি
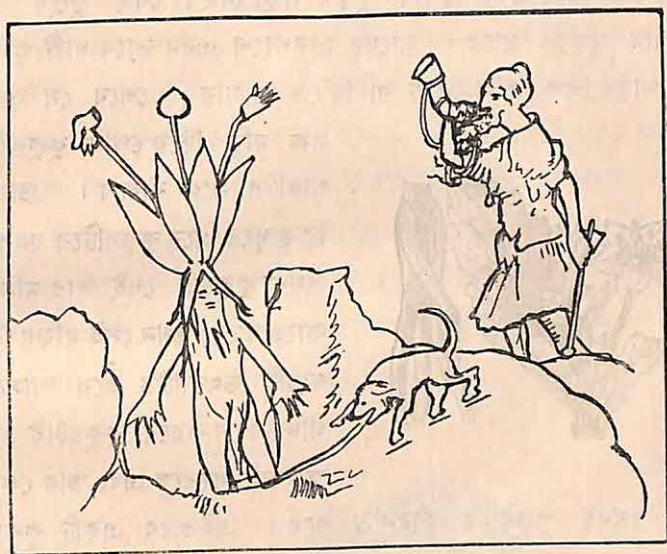
থেকে উপড়ে তুলতে হ'লে সে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করবে, সেটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই তখনকার লোক মনে করত যে, মাটি থেকে তোলার সময় ম্যানড্রেক যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠে, আর যে লোক এই কাজ করতে যায়, এই গাছ রাগে তার প্রাণ হরণ করে।

মধ্য যুগের ইউরোপীয়দের মধ্যে ম্যানড্রেক সম্বন্ধে এই রকম কুসংস্কার এত বদ্ধমূল ছিল। অনেক গ্রন্থে ম্যান্‌ড্রেক সংগ্রহকালে তার চীৎকার ও সংগ্রহকারীর বিপদ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সুতরাং এই গাছ সংগ্রহ করতে হলে খুব সাবধান হতে হ'ত। প্রথমতঃ যে লোক গাছ তুলবে, তার একটি পোষা কুকুর থাকা চাই; সেই কুকুর নিয়ে সে গাছ তুলতে যাবে। গাছের চারপাশে এমন ভাবে মাটি খুঁড়তে হবে, যাতে শিকড়গুলি কেটে বা ছিঁড়ে না যায়। শেষে সে একটি সরু দড়ি দিয়ে পোষা কুকুরটিকে গাছটির সঙ্গে বাঁধবে। তারপর কিছু দূরে গিয়ে কুকুরটিকে ডাকবে, তখন কুকুরটি যেই তার মনিবের কাছে যাবে, তখন সেই দড়ির টানে গাছটি উৎপাটিত হয়ে আসবে। গাছটি মনে করবে, কুকুরটাই তাকে স্থানভ্রষ্ট করেছে এবং তার কোপে পড়ে তখনই কুকুরটার জীবনান্ত হবে। এইভাবে একটি কুকুরের বিনিময়ে একটি ম্যান্‌ড্রেক গাছ সংগ্রহ করা হ'ত, এই ছিল সাধারণ লোকের ধারণা।
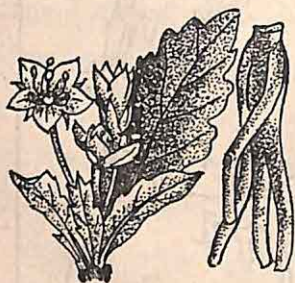
এখন এই গাছের শক্তি সম্বন্ধে সে যুগের লোকের এই যে কুসংস্কার, তার মূলে কোনও সত্য আছে কিনা দেখা যাক। ঔষধরূপে এই গাছের কিছু ব্যবহার আছে; এই গাছের রস জোলাপের কাজ

করে, এর বমনকারক আর উত্তেজক গুণ আছে। এ ছাড়া এর আর একটি গুণ আছে। এই রস বেশী পরিমাণে সেবন করলে লোক অচৈতন্য হয়ে যায় এবং রোগীকে ক্লোরোফর্ম করলে যেমন অবস্থা হয়, সে রকম হয়ে পড়ে। প্রাচীনকালে চীনের একজন চিকিৎসক এইভাবে ম্যান্‌ড্রেকের ব্যবহার করতেন। সম্ভবতঃ অতীতে কোনও এক সময় কোনও লোক এই ম্যান্‌ড্রেকের মূল খাদ্যরূপে ব্যবহার করে মারা যায় বা অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সেই ঘটনার ও গাছের শিকড়ের আকৃতি, দুই মিলিয়ে কল্পনার সাহায্যে মানুষ এই গাছকে রক্তমাংসে গড়া অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক অদ্ভুত জীব বলে ধরে নিয়েছে। আমাদের দেশের লোকেরাও কতকগুলি গাছকে তাদের উপকারিতার জন্য দেবতার আসনে বসিয়েছে, যেমন তুলসী, মনসা ইত্যাদি। কিন্তু কোনও গাছের প্রতিই এ দেশের লোকের এ প্রকার ভীতির কথা শোনা যায় নি।
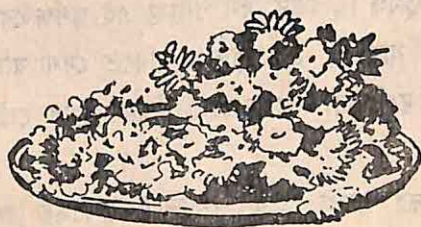
ফুলের গন্ধ

গত ফেব্রুয়ারী মাসে হল্যাণ্ডের লিডেন সহরের বটানিক গার্ডেনে একটি গাছের ফুল হয় ; তাই দেখার জন্য সহরের লোক দলে দলে বটানিক গার্ডেনে ভিড় করতে লাগল। এই গাছটি হ'ল এক রকম 'ওল'। সুমাত্রা দ্বীপের গভীর জঙ্গলে এই রকম বুনো ওল গাছ হয়। এই গাছের ওল অতি প্রকাণ্ড এবং এর পাতাও অতি প্রকাণ্ড, সুতরাং এর পুষ্পমঞ্জরীটিও সেই অনুপাতেই বিরাট আকারের হয়। মাটির উপর একটি ছয় ফুট উঁচু মোচার মত এই মঞ্জরীটি দণ্ডায়মান থাকে। এর একটি আবরণী থাকে, তা একটি ঠোঙ্গার মত মঞ্জরীটির নিম্নাংশকে ঘিরে থাকে। এই আবরণীটি উচ্চতায় ও বিস্তারে প্রায় তিন ফুট। ধীরে ধীরে এই আবরণীটি খুলতে থাকে, আর সেই সময় এই ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। এই গন্ধ মোটেই সুগন্ধ নয়, অতি বিশ্রী এক দুর্গন্ধ। তিন দিন পর্য্যন্ত এই দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, তার পর কমে যায়। ৪৪ পৃষ্ঠায় ছবিতে দেখা যাচ্ছে, লিডেনের বটানিক গার্ডেনে দর্শকেরা—নাক চাপা দিয়ে ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন।

ফুল আমাদের বড়ই প্রিয় ; কোনটি সুগন্ধের জন্য, কোনটি বা রং এর জন্য, আবার কোনটি তার অদ্ভুত আকৃতির জন্য। ওল বা কচু জাতীয় উদ্ভিদের ফুল খুবই ছোট ছোট হলেও পুষ্পমঞ্জরী আর

তার আবরণী বিচিত্র বর্ণে আর অদ্ভুত আকৃতিতে সৌন্দর্য্য-পিপাসু লোককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এগুলোর বেশীর ভাগ ফুলে এমন দুর্গন্ধ থাকে যে, সৌন্দর্য্যের কথা ভুলে ফুলের কাছ থেকে দৌড়ে পালাতে হয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কচু জাতের এক রকম ছোট ছোট গাছ হয়, তাকে কেউ বলে ঘেঁচু, কেউ বলে ভেটকোল। এই গাছটিও ফুলের দুর্গন্ধের জন্য কুখ্যাত। এর যখন ফুল ফোটে তখন ১৫-২০ গজের মধ্যে দাঁড়ান যায় না।

কলকাতার রাস্তার ধারে অনেক জায়গায় শিমুল গাছের মত একরকম গাছ দেখা যায়। এর ফুলের বীজ আগুনে সেঁকে নিলে বাদামের মত খাওয়া যায় বলে অনেকে একে জংলিবাদাম বলে। এই গাছের ফুলেও দুর্গন্ধ। শীতের শেষে এই গাছে ফুল হয়, আর ঝরা ফুলের গন্ধে এই সময় গাছের নীচে যাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে।

র‍্যাফ্‌লেসিয়ার ফুল পৃথিবীর মধ্যে সব ফুলের চেয়ে বড়; এক একটি ফুল এক একটি বড় গামলার মত। কিন্তু সেই ফুলে এমন দুর্গন্ধ যে, কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে এই ফুল দেখার উপায় নেই। তা ছাড়া এই দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পালে পালে মাছি এসে ফুলটিকে ছেয়ে ফেলে।

অর্কিডের ফুলের আদর সব দেশেই খুব বেশী। এই সব ফুলের গঠনের বৈচিত্র্যও যেমন আর এদের বর্ণ-সম্ভারও তেমনই মনোহর। এই সব অর্কিডের বেশীর ভাগ ফুলই গন্ধহীন। কিন্তু ভ্যানিলা

অর্কিডের ফুলের সুগন্ধ অতুলনীয়। আবার এমন অর্কিড আছে, যার দুর্গন্ধের জন্য ফুলের ত্রিসীমানায় তিষ্ঠান যায় না। বোর্ণিও দ্বীপে

এই রকম এক শ্রেণীর অর্কিড পাওয়া যায়। তার নাম বালবোফিলাম

বেকারি। এই অর্কিডের গাছটি একটি বৃক্ষারোহী লতা। এর ফুলগুলি ছোট ছোট, লাল ও বেগুনি রং এর। একটি বড় মঞ্জরীতে এক সঙ্গে অনেকগুলি ফুল ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে ফুটে থাকে। এক সঙ্গে অতগুলি ফুল ফুটে থাকায় এর সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই সকলকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু এই ফুলগুলি থেকে এরকম একটা উৎকট দুর্গন্ধ বার হয় যে, তা সহ্য করা শক্ত। বিলাতে এক ভদ্রলোক এই অর্কিড আনিয়ে গাছ করেছিলেন এবং তাতে যথাসময়ে ফুল ফুটেছিল। তখন একজন চিত্রশিল্পী তার ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। প্রায় তিন ঘণ্টা সে ফুলের কাছে থাকায় ফুলের দুর্গন্ধে তাঁর মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

চিরস্থায়ী পুষ্প

বাগানে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে। তুমি কতকগুলি তুলে এনে ঘরের মধ্যে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখে দিলে। ঘরের মধ্যে ফুলগুলি দেখছ, আর মনটা তোমার আনন্দে ভরে উঠছে। এই ভাবে সারাদিন গেল। পরের দিন সকালে উঠে দেখলে, ফুলের সে শোভা আর নেই, কতকগুলির পাপড়ি গেছে ঝরে, কতকগুলির বর্ণ মলিন হয়ে গেছে, পাপড়িগুলি গুটিয়ে জড়িয়ে গেছে। ফুলগুলিকে আর ফুলদানিতে রাখতে ইচ্ছে হ'ল না, দূর করে বাইরে ফেলে দিলে। বাগানে গেলে, দেখলে যে আরও কত নূতন ফুল ফুটেছে, কিন্তু আগের দিনের ফোটা ফুলগুলি ফুলদানির ফুলের মতই শুকিয়ে গেছে। মনে দুঃখ হ'ল। তুমি ভাবলে এই ফুল যদি চিরদিন এই রকম তাজা ও সুন্দর থাকত, তা'হলে কত ভাল হ'ত।

এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। সব ফুলই যে একদিন পরে শুকিয়ে বা ঝরে যায়, তা নয়, কোনও কোনও ফুল তিন-চার দিন পর্য্যন্ত বেশ তাজা থাকে। আবার কতকগুলি ফুল আছে যেগুলি শুষ্ক অবস্থায় বহুদিন পর্য্যন্ত রেখে দেওয়া যায়, অথচ তাদের সৌন্দর্য্যের কোন হানি হয় না। এইগুলিকে বলে চিরস্থায়ী পুষ্প।

এই রকম ফুলের মধ্যে প্রথমেই নাম করা উচিত হেলিক্রাইসাম ফুলের। অনেক জাতীয় হেলিক্রাইসাম আছে, তার মধ্যে হেলিক্রাইসাম

মন্‌স্ট্রোসাম্‌-এর ফুলগুলি বড় বড় আর খুব সুন্দর। হেলিক্রাইসাম আর আমাদের সুপরিচিত গাঁদাফুল একই গোত্রভুক্ত। এগুলিতে অসংক্ষ্য ছোট ছোট ফুল এক সঙ্গে গুচ্ছবদ্ধ হয়ে থাকে, আর এই এক এক গোছা ফুলকে ঘিরে একটি বহিরাবরণ থাকে। বহিরাবরণ দিয়ে ঘেরা এই রকম এক গোছা ফুলকে আপাতদৃষ্টিতে একটিমাত্র ফুল বলে মনে হয়। গাঁদা ফুলের বহিরাবরণ সবুজ, কিন্তু হেলিক্রাইসামের বহিরাবরণ নানা রংএর হয়, আর তাতে কয়েকটি থাক বা স্তবক থাকে। এক একটি স্তবকে এক সারি ছোট ছোট পাপড়ির মত জিনিস থাকে, সেগুলি মাছের আঁইসের মত শক্ত ; সেজন্য ফুলগুলি শুকিয়ে গেলেও ওগুলির কোনও বিকৃতি ঘটে না। আধফোটা অবস্থায় হেলিক্রাইসাম ফুলের যে শোভা থাকে, সম্পূর্ণ ফুটে যাওয়ার পরে সেটা কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য ফুলগুলিকে অর্দ্ধেক ফোটা অবস্থাতেই বৃন্ত সমেত কেটে নেওয়া হয়, এবং সেগুলি সম্পূর্ণ শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত অল্প অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয়। তার ফলে পরে এই ফুলের বর্ণ আর মলিন হয় না। তখন ফুলদানিতে সাজিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে দিলে আর প্রতিদিন নূতন ফুলের খোঁজ করতে হবে না।

হেলিক্রাইসাম-এর সগোত্র হ'ল হেলিপটেরাম। এই ফুল হেলিক্রাইসাম-এর মতই অনেক দিন টাটকা থাকে, আর শুকিয়ে রেখে দিলে এর সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এই দুই জাতীয় ফুল দেখতে প্রায় একরকম, আর চিরস্থায়ী পুষ্প হিসাবে এদের আদর খুবই বেশী। এই

দুই জাতীয় ফুল দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায়। ঐ দুই দেশ থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক শুকনো ফুল চালান দেওয়া হ'ত।

দার্জ্জিলিংএ এক রকম ফুল গাছ হয়, তার নাম হাইড্রাঙ্গিয়া। এর

হেলিক্রাইসাম ফুল

ফুলগুলি ফিকা নীল রংএর, একত্রে অনেকগুলি থাকে। এক একটি ফুল প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া হয়। গাছে এই ফুল অনেকদিন তাজা থাকে, আবার ডালশুদ্ধ ফুলের গোছা কেটে এনে অন্ধকারে শুকিয়ে

নিতে পারলে এই ফুলও চিরস্থায়ী হয়ে যায়। ঐ অঞ্চলের উঁচু পাহাড়ে আর এক রকম ফুল পাওয়া যায়, তার নাম নাফেলিয়াম। এই ফুল হেলিক্রাইসাম-এর সমগোত্রীয় এবং ঐ রকম শুকিয়ে রেখে দেওয়া যায়। এই ফুলের রং কাঁচা সোনার মত, কিন্তু ফুলগুলি ছোট ছোট।

আমাদের আর একটি বিশেষ পরিচিত ফুলকে ঐ প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে রাখলে তারও সৌন্দর্য্যের হানি হয় না। এই ফুলটির বাংলা নাম— বোতাম ফুল, বৈজ্ঞানিক নাম গমফ্রেনা গ্লোবোসা। ফুলটির রং লালচে বেগুনি। এই ফুল তোমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সহজ। চেষ্টা করে দেখতে পার যদি এই ফুলকে চিরস্থায়ী করতে পার। কতকগুলি ডাল সমেত ফুল নিয়ে সেগুলি এক সঙ্গে বেঁধে বাড়ীর যে ঘরে দিনের বেলাতেও অল্প অন্ধকার থাকে, সেইখানে ঝুলিয়ে রেখে দাও। যখন ফুলগুলি একেবারে শুকিয়ে যাবে, তখন তোমার ঘরে টেবিলের উপর ফুলদানিতে সাজিয়ে দাও। দেখবে সে ফুলের রং ফিঁকে হবে না।

পুনর্জীবিত উদ্ভিদ্

আমরা জানি যে, সকল প্রাণীর মতই প্রত্যেক উদ্ভিদের জীবন ও মৃত্যু আছে। একবার মৃত্যু হলে আর তাকে পুনরায় বাঁচান যায় না। কিন্তু কতকগুলি উদ্ভিদ্ আছে, মরে যাওয়ার পরেও তাদের রূপান্তর হয়,—এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন সেগুলি আবার নবজীবন প্রাপ্ত হ'ল। আবার কতকগুলি উদ্ভিদ্ আছে যেগুলি বহুদিন শুষ্ক অবস্থায় থাকার পরেও জলে ভেজানোর পর নূতনভাবে বাড়তে থাকে। এইগুলিকে শুষ্ক অবস্থায় মৃত মনে হয় বটে, কিন্তু তা ঠিক নয়। এই সব উদ্ভিদ্কে বলা হয় রেসারেক্সন্ প্লাণ্ট বা পুনর্জীবিত উদ্ভিদ্।

এই রকম একটি উদ্ভিদ্ হল আনাস্টাটিকা। উত্তর আফ্রিকায়, আরবদেশে ও সিরিয়ার মরুভূমিতে এই গাছ জন্মে। গাছটি ছয় ইঞ্চির বেশি উঁচু হয় না; গাছের গোড়া থেকে অনেকগুলি ডালপালা বার হয়, আর সেগুলি ছত্রাকারে মাটির উপর ছড়ানো থাকে। এর ছোট ছোট ফুল ও ফল হয়, তারপর গাছটি মরে যায়। তখন তার পাতাগুলি ঝরে পড়ে, ডালপালাগুলি গাছের গোড়ার দিকে বেঁকে আসে, এবং সমস্ত গাছটি কুঁকড়ে গিয়ে গোলাকার হয়ে যায়। কিছু দিন পরে হাওয়ার জোরে গাছটি শিকড় থেকে উপড়ে এসে মাটির উপর গড়াতে গড়াতে বহুদূর চলে যায়। এইভাবে গড়াতে গড়াতে যখনই জলের সংস্পর্শে আসে, কিম্বা যদি সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, তা'হলেই

সেই গোলাকার গাছের ডালগুলি আবার সোজা হয়ে যায়, এবং মাটির উপর ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্যই মনে হয়, গাছটি আবার বেঁচে উঠল ; কিন্তু আসলে তা নয়। তাছাড়া এই গাছের ফলগুলি ঝরে পড়ে যায় না, শুষ্ক গাছেই থেকে যায় ; আর গাছের ডালপালাগুলি যখন জলের স্পর্শ পেয়ে সোজা হয়ে যায়, সে সময় ফল থেকে বীজ পড়ে নূতন গাছ হয়। বহুদিন শুষ্ক অবস্থায় থাকলেও আনাসটাটিকার এই গুণ নষ্ট হয় না।

এক জাতীয় ছোট ছোট উদ্ভিদ্ আছে, তার নাম সেলাজিনেলা। সেলাজিনেলা অনেক প্রকারের আছে, আর অনেক দেশেই হয়। ভিজা ও ছায়া ঢাকা জায়গাতেই এ জাতীয় গাছ জন্মায়। সাধারণতঃ এর ডালপালাগুলো মাটির উপর একটির পাশে একটি বিছানো থাকে ; মনে হয় যেন মাটির উপর একটি ছবি আঁকা রয়েছে। শুকিয়ে গেলে প্রায় সব সেলাজিনেলারই ডালপালাগুলি গুটিয়ে আসে, আবার জল পেলেই সেগুলি সম্প্রসারিত হয়ে যায়। মেক্সিকো দেশে এক রকম সেলাজিনেলা পাওয়া যায়, তার নাম সেলাজিনেলা লেপিডোফিলা। এর ডালপালাগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট ; শুষ্ক অবস্থায় সেগুলো গুটিয়ে গিয়ে গাছটিকে একটি জটপাকান দড়ির বাণ্ডিলের মত আকৃতি দেয়। এই শুক্না তাল পাকান গাছটিকে যদি জলে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে ডালপালাগুলি আবার সোজা হয়ে গাছটি তার পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই গাছের উপরের দিক শুকিয়ে গেলেও এর কিছু কিছু অংশ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাজা থাকে। মাটি থেকে তুলে

শুকিয়ে রেখে দেওয়ার পর আবার ভিজা ছায়া ঢাকা জমির উপর জলে ভিজিয়ে যদি বসিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে গাছটি আবার সবুজ হয়ে উঠে এবং নূতন ভাবে ওর ডালপালা গজাতে থাকে। এইভাবে তিন চারবার পর্য্যন্ত গাছটিকে পুনর্জীবিত করা যায়। তবে প্রত্যেক বারই তার জীবনীশক্তি ক্ষয় হতে থাকে, বার বার শুকানোর ফলে গাছটিকে শেষ পর্য্যন্ত আর বাঁচান যায় না, যদিও ঐ শুক্‌না গাছ জলে দিবামাত্র তার ডালপালাগুলি পূর্ব্বের মত সোজা হয়ে যায়, এবং
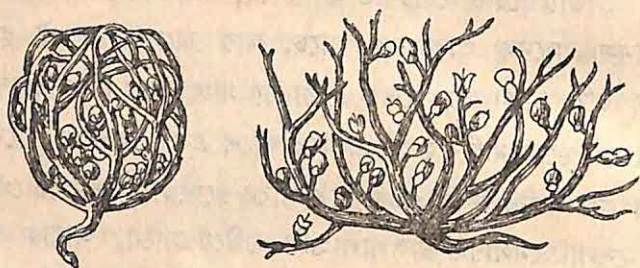
আনাস্‌টাটিকা : মৃত ও পুনর্জীবিত.

গাছটির আকার তাজা গাছের মতই হয়ে যায়। সেলাজিনেলার এই রকম গুণ থাকার জন্য সাধারণ লোকের ধারণা যে, এই গাছ থেকে তৈয়ারী ঔষধ সেবন করলে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে ও মরণাপন্ন রোগী নবজীবন লাভ করবে। এজন্য টোটকা ঔষধ রূপে এই উদ্ভিদ্ লোকে ব্যবহার করে।

কতকগুলি ফার্নজাতীয় গাছেরও এই গুণ দেখা যায়। তার মধ্যে

পলিপোডিয়াম্ পলিপোডিওইডিস্ নামে ব্রাজিলের একটি ফার্ণ বহুদিন এই রকম শুষ্ক অবস্থায় থাকার পরেও জল পাওয়া মাত্র পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া আরও কতকগুলি আছে, যেগুলি আনাস্টাটিকার মত ফুল ফল হওয়ার পর মরে যায়, আর কিছু কিছু অংশ গুটিয়ে ছোট হয়ে থাকে। আবার জল পাওয়ার সাথে সাথেই সেই অংশ সম্প্রসারিত হয়ে যায়। এ জন্য এগুলিকেও রেসারেকশান প্লাণ্টের দলেই ধরা যায়।

জ্যোতিষ্মান্ উদ্ভিদ্

আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে ভূতের কথা প্রায়ই শোনা যায়। বন, জঙ্গল, মাঠ, শ্মশান এই সব জায়গায়, সাধারণতঃ লোকালয় থেকে দূরেই নাকি ভূত বাস করে। আবার বহুকালের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়ীতেও ভূতেরা আস্তানা করে নেয়। ভূত আবার অনেক রকম আছে, তার মধ্যে একরকম ভূতের নাম আলেয়া। অন্যান্য ভূত সম্বন্ধে লোকমুখে গল্পই শোনা যায়, চাক্ষুষ ভূত দেখেছে এমন লোক পাওয়া যায় না; কিন্তু আলেয়া ভূত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, এ রকম লোক যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আলেয়া সম্বন্ধে যেটুকু বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে, রাত্রে এই ভূতের আবির্ভাব হয়; ভূত যখন ঘোরাফেরা করে, তখন হঠাৎ কোনও কোনও জায়গায় আপনা হতেই অনেকটা আগুন বা আলো জ্বলে ওঠে, অথচ সেখানে কোনও লোক আগুন বা আলো জ্বালায় না। সাধারণ লোকে এটাকে একটা ভৌতিক ব্যাপার বলেই মনে করে, এবং বিপদের আশঙ্কায় এই রকম আলো বা আগুন থেকে দূরেই থাকতে চায়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এই জিনিষটাকে অত সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তাদের কাছে আলেয়ারও নিস্তার নেই। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, এই রকম আলো অনেক কারণেই হয়, যেমন—গ্যাস থেকে পাওয়া

আলো, কীট পতঙ্গের শরীর থেকে নির্গত আলো, আর উদ্ভিদ্ থেকে পাওয়া আলো। যদি কোনও বদ্ধ স্থানে গাছের পাতা বা ছোট ছোট মাছ বা অন্য প্রাণী জমা হয়ে মরে পচে ওঠে, তখন তা থেকে এক রকম গ্যাস বার হয়, যা বাতাসের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে। পল্লী অঞ্চলে জলা জায়গায় রাত্রে যে আলেয়া দেখা যায়, তার প্রধান কারণ হল এই গ্যাস ও বাতাসের সংমিশ্রণ।

জোনাকি যেমন আলো দেয়, সে রকম কেঁচো, কেন্নাই প্রভৃতি প্রাণীর দেহ থেকেও এক রকম আলো বার হয়, কিন্তু তাতে বেশী আলো হয় না। সমুদ্রে এক প্রকার জীবাণু থাকে, সেগুলিও এক রকম আলো দেয়; এই জীবাণু এক সঙ্গে কোটি কোটি থাকে এবং যখন এগুলি জলের উপর ভেসে ওঠে, তখন এক আশ্চর্য্য আলোর খেলা দেখা যায়।

উদ্ভিদের মধ্যে যেগুলি আলোক বিকীরণ করে, তা হ'ল কয়েক জাতীয় ছত্রাক। এই সব ছত্রাকের সাধারণতঃ যে অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে আমরা বলি ব্যাংএর ছাতা। এ ছাড়া এর অন্য অংশ অতি সূক্ষ্ম সূতার জালের মত হয়। ছত্রাক ভিজা খড়কুটা, কাঠ, পচা পাতা প্রভৃতির উপর জন্মায়; ছত্রাকের এই সূক্ষ্ম জালের মত অংশ খড়কুটা বা কাঠের গায়ে ছড়ান থাকে বা তার ভিতরে প্রবেশ করে। এইগুলি ভিজা জায়গা পেলেই বিস্তৃত হতে থাকে এবং অল্প সময়েই অনেকটা জায়গা ঢেকে ফেলে; কিন্তু আবহাওয়া শুষ্ক হলেই মরে যায় বা নির্জীব হয়ে পড়ে। আলোক বিকীরণকারী ছত্রাকের

অধিকাংশই এই সূক্ষ্ম জালের মত অংশটি থেকেই আলো দেয়। কোনটির বা ছাতার চক্রাকার অংশের নিম্নভাগ থেকে, কোনটির বা ছাতার দণ্ড থেকে আলো বার হয়ে আসে। ছত্রাকটি যত সতেজ থাকে, আলোও তত উজ্জ্বল হয় এবং শুষ্ক হতে থাকলে আলোক ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যায়।

বনের মধ্যে অনেক সময় এক বিস্তীর্ণ অংশে পচা ডালপালা বা ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে এই রকম ছত্রাক জন্মে, এবং বর্ষার সময় প্রায় প্রতি রাত্রে ঐ সব জায়গা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সাধারণ লোকের কাছে এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

জীব-বিজ্ঞানী শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য একবার নিজের সাহস ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বলে এই রকম এক ভৌতিক আলোর রহস্য ভেদ করে স্থানীয় লোকের ভয় দূর করেন। এক গ্রামে জঙ্গলে ঢাকা একটি পোড়ো ভিটায় প্রতি রাত্রে আলেয়ার আবির্ভাব হয় শুনে তিনি দুই জন সঙ্গী নিয়ে এক রাত্রে সেইখানে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে, একটি প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। সেই গুঁড়িটার অনেক অংশই পচা। সারা গুঁড়িটা থেকে আলোর আভা বার হচ্ছিল। কাঠকয়লা যেমন জ্বলে, কিন্তু শিখা থাকে না,—মনে হচ্ছিল গুঁড়িটা যেন সেই ভাবেই জ্বলছে। পরের দিন সকালে সেই আলোর আর চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি সেই গুঁড়ি থেকে কয়েকটি কাঠের টুক্‌রা এনেছিলেন, সেগুলি রাত্রে জ্যোতিষ্মান্

হয়ে উঠল। এ রকম দুই রাত্রির পর সেই টুকরাগুলির আলো বন্ধ হয়ে গেল।

উপরে যে আলোকবিকীরণকারী কাঠের গুঁড়িটির কথা বলা হ'ল, সেইখানে আলোকের উৎস ছিল এক রকম ছত্রাক যা সেই গুঁড়ির উপর জন্মেছিল। কিন্তু ছত্রাক ছাড়া অন্য শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেও দু'একটিকে কখন কখন এ রকম আলোক বিকীরণ করতে দেখা যায়।

স্ফীতোদর বৃক্ষকাণ্ড

মাটির উপরে বৃক্ষের যে অংশটি স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকে, তাই হ'ল কাণ্ড বা গুঁড়ি। কাণ্ড থেকে ক্রমশঃ বের হয়ে আসে শাখা-প্রশাখা। সাধারণতঃ কাণ্ডটি নীচের দিকে মোটা হয় ; আর উপর দিকে যেমন ডালপালা বার হতে থাকে, সেইভাবে সরু হয়ে আসে। যে গাছের ডালপালা অনেক উঁচুতে হয়, তার কাণ্ডও অনেক দূর পর্য্যন্ত সমান থেকে যায়। কোনও কোনও গাছের শাখা-প্রশাখা হয় না, যেমন—তাল, নারিকেল প্রভৃতি। এই রকম গাছের কাণ্ড মাটি থেকে গাছের আগা পর্য্যন্ত সরল ভাবেই থাকে। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের কখনও কখনও ব্যতিক্রম দেখা যায়।

কলিকাতার অনেক পার্কে বা বাগানে একরকম পাম গাছ তোমরা দেখেছ, তার নাম হ'ল "রয়ষ্টোনিয়া"। এই পামগুলি দেখতে খুবই সুন্দর, সেজন্য একে বলা হয় "রয়াল পাম"। এই পামের আরও একটা নাম আছে, তা হ'ল "বটল পাম", কারণ এর আকৃতি অনেকটা বোতলের মত। কাণ্ডটি সরল ও মসৃণ এবং মাথার দিকে কিছু অংশ বোতলের গলার মত সরু। এই জাতীয় পামের মধ্যে এক একটি গাছে দেখা যায়, কাণ্ডটির মাঝখানে কিছু অংশ ফুলে উঠেছে, যদিও এই অংশটুকু বাদে কাণ্ডটি বেশ সরলই থাকে। রয়ষ্টোনিয়া ছাড়া দু'একটি ভিন্নজাতীয় পাম গাছেও কদাচিৎ কাণ্ডের এই রকম ফুলে

ওঠা দেখা যায়। শিবপুর বটানিক গার্ডেনে এরকম একটি রয়ষ্টোনিয়া আছে।

পামের পক্ষে এটা কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক নয়। তবে কয়েক জাতীয় গাছ আছে, তাদের কাণ্ড স্বাভাবিক ভাবেই মাঝখানে মোটা
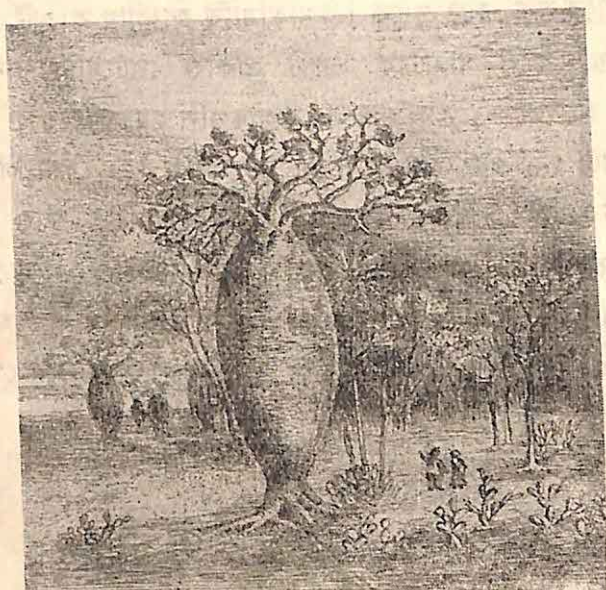
ক্যাভানিলেসিয়া আরবোরিয়া

হয়ে যায়, আর উপরে ও নীচে সরু থাকে। এই রকম একটি গাছ অষ্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়, তার নাম হল "এডানসোনিয়া গ্রেগরি"। এই গাছের গুঁড়িটি দেখতে একটি পিপার মত, সেজন্য চলতি কথায় এই গাছকে অষ্ট্রেলিয়ার "পিপাগাছ" বা "ব্যারেল ট্রি" বলা হয়।

এই প্রকার গাছের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ব্রাজিলের একটি গাছ, তার নাম "ক্যাভানিলেসিয়া আরবোরিয়া"। এই গাছগুলি ৬০-৬৫ ফুট উঁচু হয়। শাখা-প্রশাখা বেশী থাকে না। কাণ্ডটি মাটির উপর থেকে ক্রমশঃ সরু না হয়ে ক্রমশঃ মোটা হতে থাকে, তারপর আবার ধীরে ধীরে সরু হতে থাকে। মাঝামাঝি জায়গায় কাণ্ডটি বেশ মোটা হয়ে যায়, ফলে গাছটিকে একটি প্রকাণ্ড পেটমোটা দানবের মত দেখায়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে যে গাছগুলি হয়, তাদের গুঁড়িগুলোই বেশী মোটা হয়, এবং তার ব্যাস ১৫ ফুট পর্য্যন্ত হতে দেখা গিয়েছে।

ছোট ছোট উদ্ভিদের মধ্যেও কোন কোনটির কাণ্ড এ রকম মোটা হয়ে যায়। এর মধ্যে ওলকপি বা গাঁটকপি আমাদের বেশ পরিচিত। এ ছাড়া ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে অনেকেরই কাণ্ড দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান ভাবে বাড়ে বলে একেবারে গোলাকার হয়ে যায়।

বানরের পিস্তল

একবার এক বিদেশী ভদ্রলোক মেক্সিকো দেশের বনাঞ্চল পরিভ্রমণ করার জন্য গিয়েছিলেন। সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। একদিন তিনি একজন পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে বনের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় কাছেই কোথায় বন্দুক ছোঁড়ার মত শব্দ হ'ল। বনের পাখীগুলি ভয় পেয়ে আকাশে এদিক-ওদিক উড়তে আরম্ভ করে দিলে। তিনি ভাবলেন, কেউ পাখী শিকারের জন্য বন্দুক ছুঁড়ছে। তিনি বিচলিত না হয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তাঁর ঠিক পিছনে পিস্তলের আওয়াজ। ভদ্রলোক বিষম ভয় পেয়ে পিছনে তাকালেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গী ছাড়া আর কোনও লোককে দেখতে পেলেন না। তিনি তাঁর সঙ্গীর কাছে ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন। তখন সে তাকে একটি গাছ দেখিয়ে বলল যে, সেই গাছের পাকা ফলগুলি ঐরকম শব্দ করে ফেটে যায়, আর ফলের বীজ ও অন্যান্য অংশগুলি দূরে ছিট্‌কিয়ে পড়ে। বনের মধ্যে এই রকম শব্দ হয় বলে ও দেশের লোকেরা ঐ গাছের নাম দিয়েছে বানরের পিস্তল।

বানরের পিস্তলের প্রকৃত নাম হুরা ক্রেপিটান্‌স্। এই গাছ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে জন্মে। গাছের ফলগুলি চক্রাকার, চওড়ায় প্রায় চার ইঞ্চি, আর তার অর্দ্ধেক উঁচু। ফলটির

গায়ে উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫টি দাগ থাকে। ফলটি যেমন ধীরে ধীরে পাকতে থাকে, ঐ দাগগুলিতে একটি একটি খাঁজ পড়ে, আর ফলটিতে ততগুলি অংশ হয়। যখন সম্পূর্ণ পাকে,
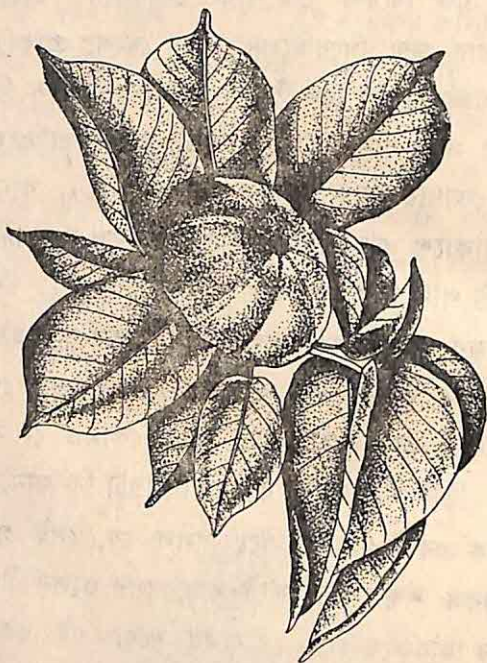
হুরা ক্রেপিটান্স্

তখন রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে হঠাৎ বিষম জোর শব্দ করে ঐ অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে বহুদূর গিয়ে পড়ে। ফলের এই অংশগুলি আর

বীজগুলি খুবই শক্ত, সুতরাং ছিট্‌কে পড়ার সময় কোনও লোকের গায়ে লাগলে তাকে কাবু করে দেয়। ফলের অন্যান্য অংশের চেয়ে বীজগুলি আরও দূরে গিয়ে পড়ে, ফাঁকা জায়গায় ৬০-৭০ গজ দূর পর্য্যন্ত যায়।

ঐ গাছের গায়ে কাঁটা থাকে বলে আর এর ফলগুলি এই রকম ভাবে ফেটে যায় বলে এর শত্রুরা সহজে গাছের কাছে আসে না। ফল ফেটে বীজগুলি ছিট্‌কিয়ে দূরে পড়ায় আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য একটি কাজও ভাল ভাবেই হয়, তা হ'ল নূতন চারাগাছগুলিকে দূরে দূরে রাখা। যদি কোনও গাছের বীজ সেই গাছেরই নীচে জমা হতে থাকে, তা'হলে একই জায়গায় অনেকগুলি একই জাতীয় গাছ জন্মায়, তার ফলে সবগুলিরই খাদ্যাভাব হয়, আর কোনটিই সতেজ ও পুষ্ট হতে পারে না। সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গাছের বীজ দূরে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও গাছের বীজ হাওয়ায় উড়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে; কোন কোনও গাছের বীজ বা ফলে কাঁটা থাকায় পশুপাখীর গায়ে আটকিয়ে যায় এবং পশুপাখীর সঙ্গে এক জাগয়া থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে পড়ে। জলজ উদ্ভিদের বেলায় এক জায়গার গাছের বীজ বা ফল জলে ভেসে ভেসে অন্য জায়গায় গিয়ে হাজির হয়।

ফল ফেটে গিয়ে বীজ ছড়িয়ে যাওয়া, হুরা ক্রেপিটান্‌স্‌ ছাড়া অন্য অনেক গাছেতেই লক্ষ্য করা যায়। কাঞ্চন ফুলের গাছ অনেকের বাগানেই থাকে। এই গাছের ফলগুলি লম্বা ও চেপ্টা। যখন

পেকে শুকিয়ে যায়, সেগুলি লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়, আর দুটি টুকরো আলাদা হয়ে পাক খেয়ে যায়। এজন্য তার বীজগুলি চারিদিকে ছিট্‌কিয়ে পড়ে। বাসক জাতীয় গাছের ফলে বীজের
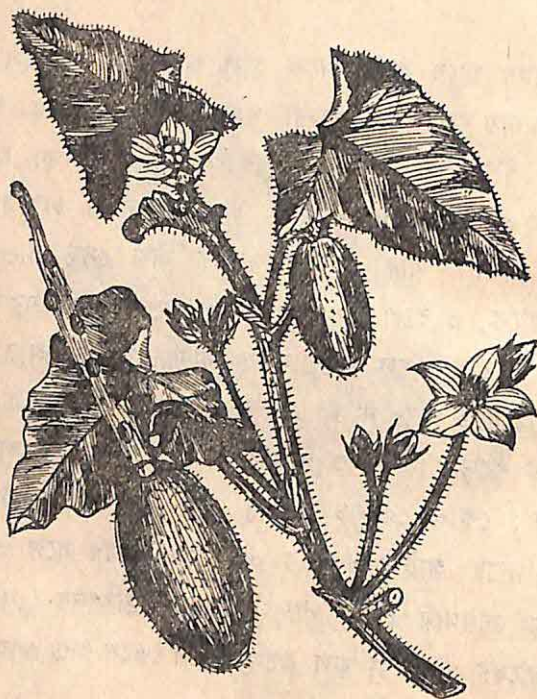
একবালিয়াম্

নীচে একটি বাঁকা কাঠির মত থাকে। ফল পেকে গেলে ফেটে যায়, আর সেই কাঠির মত জিনিষটা বীজগুলিকে ধাক্কা দিয়ে দূরে

ফেলে দেয়। যে সমস্ত গাছের ফল পাকলে শুকিয়ে যায়, তার মধ্যে অধিকাংশই আপনা আপনি ফেটে যায়, আর তাদের বীজ হাওয়ায় উড়ে যায়, কিম্বা ছিট্‌কিয়ে দূরে গিয়ে পড়ে। আর যে-সব ফল পাকলে নরম হয়, তাদের অধিকাংশই পশুপাখীর সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্যত্র গিয়ে পড়ে।

ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী দেশে একটি লতা জন্মে, তার নাম 'একবালিয়াম্'। এর ফলগুলি ছোট ছোট কাঁকুড়ের মত; ফলের বৃন্তটি ফলের ভিতর সামান্য প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। যখন ফল পাকে, সেটি বৃন্ত থেকে খসে যায়, আর সেই জায়গায় একটি ফুটা হয়, যেন একটি গোলাকার বোতলের ছিপি খোলা হ'ল। সেই সময় ফলের অন্তঃস্থলে একটা চাপ পড়ে। তখন সেই চাপের ফলে বীজগুলি ফলের রসের সঙ্গে পিচকারির মত ফুটাটি দিয়ে বের হয়ে আসে। এই ফলের যদি নাম দেওয়া যায় তুবড়ি বাজী ফল, তা'হলে বোধ হয় বিশেষ ভুল হবে না।
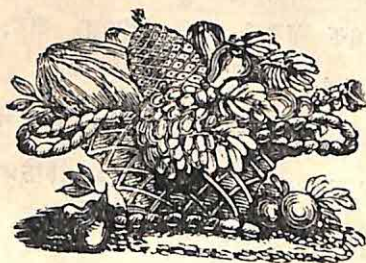
বড় ফল

আমাদের যা খাদ্য, তার অনেকটা অংশ জুড়ে আছে গাছের ফল। কোনও কোনও গাছের ফল রন্ধন করার পর খাওয়ার উপযুক্ত হয়, আবার কোনও কোনও গাছের ফল রন্ধন না করেও খাওয়া যায়। ফলের জন্য এই সমস্ত গাছ বাগানে লাগান হয় বা ক্ষেতে চাষ করা হয়। এই সব গাছের ফলগুলি যত বড় হয়, আমাদের ততই আনন্দ হয়, কিন্তু সব গাছের ফল বেশী বড় হয় না। যে সব ফল বড় হয়, তার মধ্যে লাউ, কুমড়া, তরমুজ আর কাঁটাল, এইগুলি সময় সময় এত বড় হয় যে, দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। একটি লাউ এক ফুটের বেশী উঁচু আর ১৮ ইঞ্চি চওড়া হতে পারে, একটি তরমুজ লম্বায় চওড়ায় এক ফুট হতে পারে, একটি কুমড়া অনায়াসে ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও এক ফুট চওড়া হয় এবং একটি কাঁটালও ঐ রকমই বড় হয়। একটি চালকুমড়া এক ফুটের বেশী লম্বা হয়, যদিও চওড়ায় ৫-৬ ইঞ্চির বেশী হয় না। আমরা কলকাতায় যে শশা দেখি, তা খুব বড় নয়; কিন্তু দার্জ্জিলিংএ এক রকম শশা পাওয়া যায়, তার চেহারা ঠিক একটি চালকুমড়ার মত।

এই যে বড় বড় ফলের নাম করা হ'ল, এরা সকলেই লম্বায় একটি ফলের কাছে হার মানে, সেই ফলের নাম চিচিঙ্গা। একটি চিচিঙ্গা সাধারণতঃ তিন ফুটের বেশী লম্বা হয়, চার ফুট বা তারও বেশী লম্বা চিচিঙ্গাও সচরাচর দেখা যায়। চিচিঙ্গার এই রকম আকারের জন্য

এর ইংরেজী নাম দেওয়া হয়েছে 'স্নেক্ গোর্ড'। নামকরণটি যে উপযুক্ত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চিচিঙ্গার মত লম্বাকৃতি ফল আর একটি আছে, তার হিন্দী নাম কাঁকড়ী। এগুলিও দুই ফুট, কখনও কখনও তিন ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। বিহার ও উত্তর প্রদেশে এই ফলের চাষ হয়; এগুলি শশার মত
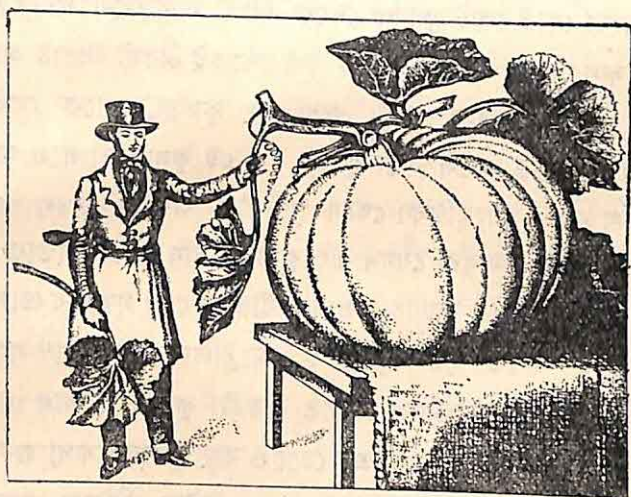
মিঃ লিথেস ও তাঁর কুমড়া

খাওয়া যায়। আরও কয়েকটি গাছের ফল বেশ লম্বা হয়, তার মধ্যে সোন্দাল বা বানরলাঠি আমাদের বেশ পরিচিত। সোন্দালের ফল ঠিক লাঠির মত, প্রায় দুই ফুট লম্বা হয়। সোনা গাছ বা সোনা পাতা গাছের ফলও প্রায় দুই ফুট লম্বা হয়; এই ফলগুলি চেপ্টা, যেন

একটি তলোয়ার। লাউ দুই রকম আকৃতির হয়, একটি লম্বা ও চওড়ায় প্রায় সমান, আর দ্বিতীয়টি চওড়া অপেক্ষা লম্বায় অনেক বেশী। এই রকম লম্বাকৃতি লাউ দুই ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। সম্প্রতি দিল্লীর এক প্রদর্শনীতে তিন ফুট লম্বা একটি লাউ দেখা গিয়েছিল।

এই যে বড় বড় ফলগুলির নাম করা হ'ল, তার মধ্যে কাঁটাল এক বৃন্তে অসংখ্য ছোট ছোট ফুলের থেকে একটি মাত্র ফলে পরিণত হয়। অন্যান্য ফলগুলির বেলায় একটি ফুল থেকেই একটি বিরাট আকারের ফল হয়। চালকুমড়া ছাড়া অন্য যে কুমড়া, তাকে কেউ বলে মাঠ কুমড়া, কেউ বলে মিঠা কুমড়া। এই কুমড়া আসলে আমাদের দেশীয় ফল নয়; আমেরিকা থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এসেছে। আমাদের দেশে আমরা যেমন এই কুমড়ার চাষ করি, অন্যান্য দেশেও তেমনই করে। আর অন্যান্য দেশে চাষীরা গাছের যত্ন খুব ভালভাবেই করে, সেজন্য ফলও খুব বড় হয়। অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ সহরে গত বছর এক প্রদর্শনী হয়েছিল। তাতে একটি কুমড়া দেখান হয়েছিল, তার ওজন ছিল দুই মণ। এর চেয়েও বড় কুমড়ার কথা শুনা যায়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাফোক নগরে মিষ্টার লিথেস্ নামে এক ভদ্রলোকের বাগানে কতকগুলি কুমড়া হয়। তার একটির ওজন ছিল দুই মণ ষোল সের। এই কুমড়াটি লম্বায় প্রায় চার ফুট আর প্রস্থে পাঁচ ফুটেরও কিছু বেশী ছিল। সম্ভবতঃ ঐটাই পৃথিবীর বৃহত্তম ফল ছিল।

আমিষাশী উদ্ভিদ্

প্রত্যেক জীবই আহার গ্রহণ করে, যার ফলে সে বেঁচে থাকে এবং তার কলেবর বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদ্‌ও আহার গ্রহণ করে, কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি জীবজন্তুদের মত নয়; আর তার খাদ্যও ভিন্ন-প্রকার। সাধারণ বৃক্ষলতা তাদের শিকড়ের সাহায্যে জল ও তার সঙ্গে নানাপ্রকার লবণজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ, আর পাতার সাহায্যে বাতাসের নানা প্রকার গ্যাস তাদের শরীরের মধ্যে টেনে নেয়, এবং তা' হতেই তাদের শরীর গঠন করে। কিন্তু কয়েকটি উদ্ভিদ্ এতেই সন্তুষ্ট থাকে না। তারা নানা উপায়ে ছোট কীট পতঙ্গকে বন্দী করে ফেলে। আর ধীরে ধীরে তাকে জীর্ণ করে আপনার শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এই সমস্ত উদ্ভিদ্‌কে আমিষাশী উদ্ভিদ্ বলা হয়।

রূপকথার গল্পে এক রকম বৃক্ষ বা লতার কথা শোনা যায় যেগুলির প্রকৃতি অতি হিংস্র। তারা নাকি তাদের আয়ত্তের মধ্যে পেলে মানুষ অথবা বড় বড় জন্তু-জানোয়ারকে তাদের ডালপালার মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে অতি অদ্ভুত উপায়ে খেয়ে হজম করে ফেলে। এ রকম গল্প যে আমাদের দেশেই চলতি আছে তা নয়, অন্যান্য দেশের রূপকথার মধ্যেও এই প্রকার রাক্ষস প্রকৃতির গাছের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বাস্তব জগতে এরকম কোনও বৃক্ষলতার সন্ধান আজ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নি, যা বড় বা ছোট জন্তু-জানোয়ার ধরে খেয়ে

ফেলতে পারে। আমিষাশী উদ্ভিদেরা যে সমস্ত প্রাণীকে শিকার করতে পারে, তাদের মধ্যে পিঁপড়া, মৌমাছি আর প্রজাপতির চেয়ে বড় কেউ নেই। যাহোক এখন কয়েকটি আমিষাশী উদ্ভিদের কথা বলি।

বাংলা দেশের খানা ডোবায় একরকম উদ্ভিদ্ হয়, তাকে আমরা বলি ঝাঁঝি। জটপাকান সবুজ সূতার মত এগুলি জলে ভেসে থাকে; ছোট ছোট হলুদ রংএর ফুল হয়। এই ঝাঁঝিগুলো অন্য খাদ্য ছাড়াও আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে। ঝাঁঝির ডালপালায় ঘটের মত কতকগুলি জিনিষ আছে, এইগুলি আকারে প্রায় একটি সরিষার দানার মত; এগুলির ভিতরটা ফাঁপা, পাশের দিকে একটা ছিদ্র আছে, আর ছিদ্রমুখে একটি ঢাকা আছে। ঝাঁঝি এই ছিদ্র দিয়ে ঘটের মধ্যে জল টেনে নেয়; সেই সময় খুব ছোট ছোট জলজ কীট জলের সঙ্গে সেই ঘটের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন ঘটের ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে যায়, আর কীটগুলো বাইরে আসতে পারে না; ঘটের মধ্যে থেকে মরে গিয়ে ঝাঁঝির খাদ্যে পরিণত হয়, এবং ঘটের জলের সঙ্গে ঝাঁঝি সেটা শোষণ করে নেয়। তারপর ঘটের ছিদ্রপথ খুলে যায়, ঝাঁঝি তখন তার মধ্যে আবার জল টেনে নেয়।

বাংলাদেশের অনেক জায়গায় খোলা মাঠে একরকম ছোট ছোট গাছ দেখা যায়। ঐগুলির একটি সরু কাণ্ড থাকে, সেটি সোজা উপরদিকে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়; তার গোড়ায় একগোছা ছোট ছোট পাতা থাকে। পাতাগুলোর রং লাল, মাটির উপর

পাতাগুলি বিছানো থাকে। তাতে মনে হয় যে, মাটির উপর গোলাকার একটি লাল দাগ হয়ে আছে,—পান খেয়ে মাটিতে পিক ফেললে যেমন দেখায় সেইরকম। সেইজন্য গাছটির নাম হয়েছে "পানের
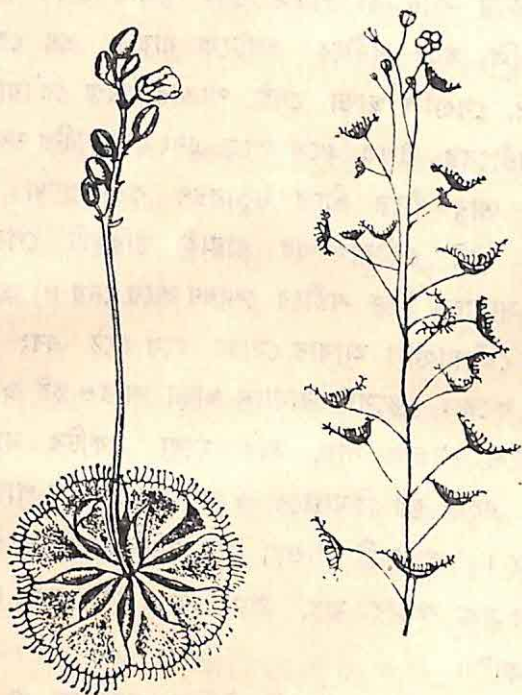
ড্রসেরা

পিক"। এর বৈজ্ঞানিক নাম "ড্রসেরা বার্মানি"। এই পানের পিকও একপ্রকার আমিষাশী উদ্ভিদ্। এর পাতার উপর কতকগুলি লম্বা

লম্বা রোঁয়ার মত আছে। ঐ রোঁয়াগুলির মাথাটি একটু মোটা ও গোলাকার, অনেকটা দেশলাইএর কাঠির মত। রোঁয়াগুলির মাথার মোটা অংশটি থেকে এক প্রকার আঁঠাল পদার্থ বের হয়। যদি কোনও ক্ষুদ্রকায় কীট বা পতঙ্গ সেই পাতার উপর বসে, তাহলে এই রোঁয়াগুলি তার শরীরে আটকে যায়। যে রোঁয়াগুলিকে চেপে সে বসে, সেগুলি ছাড়া সেই পাতার অন্য রোঁয়াগুলি বাঁকা হয়ে তার শরীরের উপর এসে পড়ে এবং পোকাটির সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরে। তখন তার ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। এই রোঁয়াগুলির দ্বারাই উদ্ভিদ্‌টি পোকার শরীর থেকে তার সারাংশ নিজ শরীরে শোষণ করে নেয়। এইভাবে পাঁচ সাতদিন পরে রোঁয়াগুলি আবার সোজা হয়ে ওঠে এবং নূতন ভাবে কাজ আরম্ভ করে। ড্রসেরা বার্মানি ছাড়া আরও দুই জাতীয় ড্রসেরা আমাদের দেশে পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটির নাম "ড্রসেরা পেলটাটা"। এইটি হয় হিমালয়ে ও আসামে। এর পাতার ফলকটি অর্দ্ধচন্দ্রের মত। অপরটি পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতে ও আসামে। এর পাতাগুলি সরু সূতার মত, প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। এর নাম "ড্রসেরা ইণ্ডিকা"।

আর একটি জলজ আমিষাশী উদ্ভিদ্ পূর্ব্ববঙ্গে ও ২৪ পরগণা জেলায় পাওয়া যায়, এর বৈজ্ঞানিক নাম "আল্‌ড্রোভাণ্ডা"। এই উদ্ভিদের একটি সূতার মত কাণ্ড থাকে, এবং তার গাঁটে গাঁটে ঘন সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট পাতা থাকে। পাতাগুলি বৃন্তের দিকে সরু ও

লম্বা এবং আগার দিকে চওড়া ও গোল। এই পাতার উপর যদি কোনও কীট এসে বসে, পাতাটি তৎক্ষণাৎ মধ্যশিরা বরাবর তুই পাশ থেকে মুড়ে বন্ধ হয়ে যায়, আর পাতার চাপের ফলেই কীট মরে যায়। তখন পাতার থেকে এক রকম রস বার হয়, তাতেই পোকাটি জারিত হয়ে যায় এবং তার সারাংশ উদ্ভিদের দেহে শোষিত হয়ে যায়।

আর একটি উদ্ভিদ্ ঠিক একই প্রক্রিয়ায় শিকার ধরে ; এর নাম "ডাইয়োনিয়া"। এটি পাওয়া যায় ইউরোপে। এই উদ্ভিদ্ জলে হয় না, ডাঙ্গাতেই হয়। ড্রসেরা, আল্‌ড্রোভাণ্ডা ও ডাইওনিয়ার পাতা খুবই ছোট ছোট ; কাজেই এরা যে পোকা ধরতে পারে, তাও খুব ছোট।

আসামের খাসিয়া পাহাড়ে এক রকম আমিষাশী উদ্ভিদ্ হয়, তার নাম "নেপেনথিস্"। এই উদ্ভিদ্ অন্য বৃক্ষের উপর হয়ে থাকে, সাধারণতঃ মাটিতে হয় না। এর পাতাগুলি লম্বা, আর পাতার আগায় ঠোঙ্গার মত একটি জিনিষ হয়, তার আকৃতি একটি জগের মত। এজন্য কেউ কেউ একে ঘটপত্রি উদ্ভিদ্ বা কলসগাছ বলেন। এই জগ বা ঘটের মত জিনিষটি প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা, ভিতরে কাঁটার মত রোঁয়া আছে, আর মুখের কাছে একটি ঢাকনা আছে। ঘটের ভিতরে এক রকম রস জমা হয়ে থাকে। কোনও কীটপতঙ্গ ঘটের মধ্যে প্রবেশ করলে আর বাইরে আসতে পারে না, শেষে সেই রসের মধ্যে ডুবে মরে যায় ; সেই রসের সঙ্গেই উদ্ভিদ্

সেটাকে শোষণ করে নেয়। ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অনেক জাতীয় নেপেনথিস্ পাওয়া যায়। তাদের কোন কোনটির পাতার ঘটগুলি ছয় ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়। একটা ছোট ইঁদুর বা ব্যাঙ্ স্বচ্ছন্দে তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, কিন্তু একটা ইঁদুর কিম্বা ব্যাঙ্কে ধরে রাখার মত শক্তি এদের নেই।

হেলিয়ামফোরা সারাসেনিয়া ডার্লিংটোনিয়া

নেপেনথিস্ ছাড়া আরও কতকগুলি আমিষাশী উদ্ভিদ্ আছে, যাদের পাতাতেও এই রকম ঠোঙ্গার মত হয়। নেপেনথিস্এর পাতার কিছু অংশ দিয়ে এই ঠোঙ্গার মত জিনিষটি তৈরী হয়; আর কিছু অংশ সাধারণ পাতার মতই থাকে, কিন্তু অন্যগুলিতে সমস্ত পাতাটাই ঠোঙ্গার মত হয়ে যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে "সারাসেনিয়া", "হেলিয়ামফোরা" ও "ডার্লিংটোনিয়া"ই প্রধান। এগুলি পাওয়া যায় আমেরিকায়। কোন কোন সারাসেনিয়ার পাতা বাঁকা হয় এবং পাতার মাঝখানের অংশ

বেশী মোটা হয়, আবার কোনটির পাতা বেশ সোজা হয়, আর আগার দিকেই বেশী মোটা হয়। এই পাতাগুলি সাধারণতঃ এক ফুটের কম লম্বা হয়, তবে "সারসেনিয়া ড্রুমণ্ডি"র পাতা প্রায় তিন ফুট লম্বা হয়। হেলিয়ামফোরার পাতা সোজা অথবা ঈষৎ বাঁকা হয়, আর কোন কোনটি প্রায় দুই ফুট লম্বা হয়। ডার্লিংটোনিয়ার পাতার আকার বড় অদ্ভুত। এগুলি প্রায় সোজাই থাকে, তবে পাতার অগ্রভাগ একেবারে বাঁকা হয়ে নীচের দিকে ঘুরে যায়, আর সেই জায়গাটা মাছের লেজের মত দুই পাশে বেড়ে যায়। এই পাতা বা পাতার ঠোঙ্গা তিন ফুটেরও বেশী লম্বা হয়। ডার্লিংটোনিয়াকে কেউ কেউ "ক্রাইসামফোরা" নামে অভিহিত করেন।

বহুরূপী বৃক্ষ

বাগানের গাছে অনেক সময় একটা ছোট্ট জানোয়ার দেখা যায়, তার নাম গিরগিটি। তার গায়ের রং গাছের শুকনা ডালের মত, সেজন্য সহজে এই জীবটি চোখে পড়ে না। এই গিরগিটির গায়ের রং কিন্তু সব সময়ে এক রকম থাকে না; ইচ্ছামত সে তার গায়ের রং কখনও লাল, কখনও সবুজ করতে পারে। এজন্য গিরগিটিকে অনেকে বলে বহুরূপী। সকল জন্তু-জানোয়ার বা কীট-পতঙ্গ এভাবে ইচ্ছামত নিজের রূপ বদলাতে পারে না, তবে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক কীট-পতঙ্গের শরীরের অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে।

গাছপালার মধ্যেও বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত যে রূপান্তর হয়, তা কখন কখন খুবই আশ্চর্য্যজনক মনে হয়। গাছের পাতার রং বদলানো তোমরা সকলেই লক্ষ্য করেছ। কচি পাতার রং এক রকম থাকে, তারপর তার স্বাভাবিক রং দেখা দেয়। আবার পাতা ঝরার আগে তার রং হলুদ বা লাল হয়ে যায়। পাতার সৌন্দর্য্যের জন্য কোচিয়া নামে এক রকম ছোট গাছ লোকে বাগানে রোপণ করে। সাধারণতঃ টবেতেই এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে। এই গাছ দুই ফুটের বেশী উঁচু হয় না; সরু সরু অনেকগুলো ডাল আর তাতে সরু সরু অনেক পাতা থাকে। পাতার রং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিকা সবুজ; কিন্তু গাছে যখন ফুল-ফল হয়, তখন গাছের সমস্ত

পাতা একসঙ্গে লালচে বেগুনী রংএ পরিবর্ত্তিত হয়ে সমস্ত গাছের এক বিচিত্র শোভা হয়।

আর এক রকম ফুলের গাছ তোমরা অনেকেই দেখেছ, তার নাম স্থলপদ্ম। এই ফুলের রং প্রথমে যে রকম থাকে, পরে ঠিক সে রকম থাকে না। যে ফুলের রং প্রথমে সাদা থাকে, তা ক্রমশঃ গোলাপী হয়ে ওঠে, আর প্রথমে যে ফুল গোলাপী হয়, তার রং ধীরে ধীরে ফিকা বেগুনি হয়ে যায়। ভিক্টোরিয়া-রিজিয়ার ফুল প্রথমে সাদা থাকে, কিন্তু পরে ফিকা বেগুনী হয়ে যায়। অশোক ফুল প্রথমে হলুদ বর্ণ থাকে, পরে লাল হয়ে যায়। আর একটি গাছ আছে, তার নাম ফ্রানসিসিয়া অথবা ব্রুণফেলসিয়া। এর পাতায় ভরা ডালপালাগুলো মাটিতে ঝুলে ঝুলে পড়ে। এর ফুল প্রথমে হয় নীল বা ভায়োলেট রংএর, তারপর ধীরে ধীরে সেই ফুল হয়ে যায় সাদা, কিংবা ফিকা হলুদ রংএর।

(১নং চিত্র)

এই যে সব গাছের কথা বলা হ'ল, এসবের পাতার রং বা ফুলের রং বদল হলেও গাছের সম্বন্ধে কোনও ভুল হয় না। এইবার একটি গাছের কথা বলব, যার বিভিন্ন বয়সের

আকৃতিতে এত প্রভেদ যে, একই গাছকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন গাছ বলে মনে হয়। এই গাছের নাম সিউডোপানাক্স্ ক্রাসিফোলিয়াম। এর জন্মস্থান নিউজিল্যাণ্ড। বিভিন্ন বয়সে এই গাছে বিভিন্ন প্রকার পাতা হওয়ায় গাছের রূপও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে যায়। বীজপত্রের পর প্রথমে যে পাতাটি বের হয়, তা প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা ও তার এক চতুর্থাংশ চওড়া; বৃন্ত প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা। এর পরের পাতাগুলো প্রায় ঐ প্রকার, তবে লম্বায় কিছু বড় হয়, আর বৃন্তটি ছোট হয়ে যায় এবং কিছুকাল পরে পাতাগুলো একেবারে বৃন্তহীন হয়ে পড়ে। এর পর পাতাগুলো লম্বায় খুবই বড় হতে থাকে, কিন্তু চওড়ায় মোটেই বাড়ে না, যার ফলে পাতাগুলোকে এক একটি কাঠির মত দেখায়। এই পাতাগুলো বেশ শক্ত হয় ও নীচের দিকে ঝুলে থাকে (১নং চিত্র দেখ)। এই ভাবেই গাছটি ১৫।২০ বছর ধরে বাড়তে থাকে, আর ১৫।২০ ফুট লম্বা হয়। গাছের ডালপালা তখনও পর্য্যন্ত কিছু থাকে না—শুধু একটি সরল কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে ৪০।৪২ ইঞ্চি লম্বা পাতাগুলো ছাতার শিকের মত ঝুলে ঝুলে থাকে।
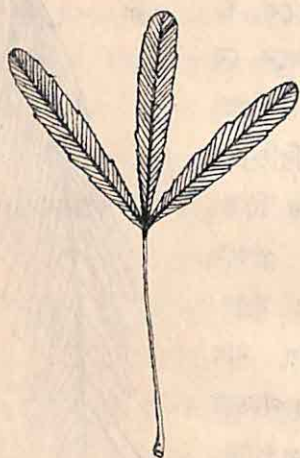
(২নং চিত্র)

এ পর্য্যন্ত এই গাছের যে পাতা হয়, তা হ'ল সরল পত্র, অর্থাৎ একটি পাতার একটি মাত্র ফলক থাকে। এর পর কিছুদিন সরল পত্রের বদলে যৌগিক পত্র হতে থাকে, আর এই রকম পাতায় একটি বৃন্তে সরু সরু তিনটি, কখনও বা তার বেশী পত্রিকা থাকে। এই
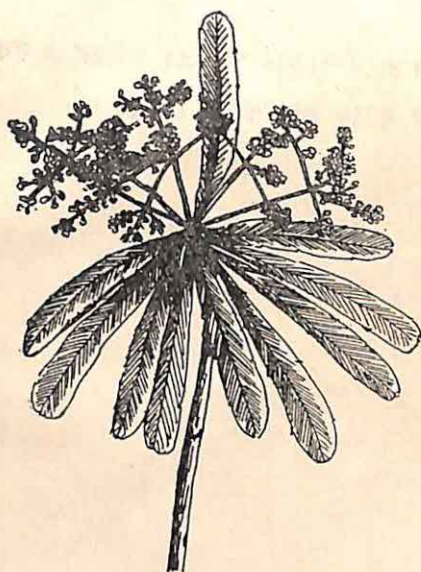
(৩নং চিত্র)

পত্রিকাগুলো প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা হয়। এর পরের অবস্থায় এই যৌগিক পত্রের পত্রিকাগুলো লম্বায় ছোট হয়ে যায় এবং বৃন্তটি আর একটু লম্বা হয় (২নং চিত্র দেখ)। এই সময় গাছের ডালপালা বের হতে থাকে, আর কখনও কখনও ফুলও হয়। এর পর পাতাগুলো

আবার সরল পত্র হয়—আর বৃন্ত খুবই ছোট হয়ে যায়। পাতাগুলো মোটা আর শক্ত হয়ে প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা হয় (৩নং চিত্র দেখ)। গাছের অনেক ডালপালা হতে থাকে, কিন্তু উঁচু আর বেশী হয় না। এখন প্রতি বছর নিয়মিত ফুল-ফল হয়। এই হ'ল গাছের শেষ পর্য্যায়ের রূপ।

দীর্ঘকাল একভাবে থাকার পর এই গাছের এ রকম অদ্ভুত রূপান্তর উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীদের কাছে এক সমস্যা বিশেষ।

সমাপ্ত